: ভূমিকা :

:: ভূমিকা ::

অজস্র নদী-জলধারার মিলন স্থান সমুদ্র তেমনি ভারতবর্ষ নানাবিধ মানব ধারার মহামিলনস্থান। মহাজনসমুদ্র। ভারতবর্ষ সত্যই এক অপরূপ দেশ। ইহার কন্যাকুমারী হইতে কাশ্মির এবং পুরুষপুর হইতে অরুণাচল পর্যন্ত বৈচিত্র্যের অজস্র সমাবেশও প্রকাশ। এখানে একদিকে যেমন আছে প্রচুরতম বৃষ্টিপাতের কেন্দ্র চেরাপুঞ্জী তেমনি আছে শুষ্কতম মরুভূমি 'থর'। যেমন আছে পার্বত্যভূমির উচ্চতম স্থানে শহর নগর তেমনি আছে জলের উপর নৌকায় স্থায়ী বসবাস। এই বিরাট দেশের প্রকৃতির গঠন ও অবস্থান যেমন বিচিত্র তেমনি এই বিচিত্র জনপদে বসবাসকারী জনগণের দৈহিক গঠন, তাদের আচরণ, অবস্থান, তাহার বিহার, খাদ্য খাবার, সংস্কার সংস্কৃতি এবং ভাষা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ।

ভারতবর্ষের অন্যতম দেশ বঙ্গদেশ বঙ্গদেশ সম্পর্কেও এই কথা প্রায় সমানভাবে প্রযোজ্য।[1] বিশাল দেশ ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যকে সংক্ষিপ্ত অথচ সুসমৃদ্ধ ও সুন্দররূপে একই সঙ্গে লক্ষিত হইল আশ্রিত হইয়া বাঙলা দেশে। বাঙলাদেশ যেন বৈচিত্র্যময় বিশাল ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ভারতবর্ষের মতোই এদের মত বৈচিত্র্যের পূজারী বাঙলাদেশ। গঙ্গা করতোয়া লৌহিত্যাবিধৌত, সাগর-পর্বতযুক্ত রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গদেশ প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান অভ্যুদয় পর্যন্ত কতজন, কত-বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা বহন করিয়া আসিয়াছে এবং এক এক ধীরে কোথায় কে কি ভাবে বিলীন হইয়া গিয়াছে ইতিহাস তাহার সঠিক হিসাব রাখে নাই। কালে কালে বাঙলাদেশ বৈচিত্র্য-এর উৎকর্ষ ডানা মেলাইয়াছে দেশের ঘরে ঘরে। যুগে যুগে কত বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের মানুষ তাহার সেই বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হইয়া বৈচিত্র্যময় বাঙলার জনসমুদ্রে তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া এক হইয়া গিয়াছে। তাহাদের এক একটি বৈশিষ্ট্যের বহু সংস্কৃতির অঙ্গে এইএকটি অলঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে।

'জল প্রবাহ যে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা, সে ধারা কখনও একটা নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া ঠেকিয়া যাইতে পারে না এবং তাহার ইতিহাস কোথাও শেষ হইয়া যায়না। সেই ধারা এখনও বহমান। *****

বাঙলার বাহিরের অনেক রাজবংশের পরাক্রান্ত রাজারা সৈন্যসামন্ত লইয়া বহুবার বাঙলাদেশ আক্রমণ করিয়াছেন, কমবেশি জয়ও করিয়াছেন, এবং তাহার পর বিজয়গর্ব লইয়া, বহুবিধ ঐশ্বর্য লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। সৈন্যসামন্ত ইত্যাদি সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ বিজেতা প্রভুর সঙ্গেই ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহারা স্থায়ী বাসিন্দা রূপে রহিয়া থাকিয়া

১। 'ভারতবর্ষের অন্যতম প্রান্তিক দেশ বঙ্গভূমি সম্বন্ধেও একথা সমান প্রযোজ্য।' বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ২৯, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

থাকিয়া গিয়াছে, তাহার জনসমুদ্রে জলবিন্দুবৎ কোথায় যে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহার কোনও হিসাব নাই। ইহারা ছাড়া, পাল ও সেন রাজাদের পট্টোলীগুলিতে এবং সমসাময়িক বাংলার অন্যান্য লিপিতে দেখা যায় অনেক অবাঙালী ভারতীয় লোক উপকোমের উল্লেখ। ভূমিদান বিষয়ের পট্টোলীগুলিতে দান বিজ্ঞপ্তি যাহাদের নিকট বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে, সেখানে বিভিন্ন রাজকর্মচারী, স্থানীয় মহত্তর, কুটুম্ব, ভট্টম্ব ইত্যাদির পরেই নাম করা হইতেছে নানা লোক ও উপকোমের। দৃষ্টান্তস্বরূপ মদনপালের মনহলি পট্টোলীর তালিকাটি উদ্ধার করা যাইতে পারে, রাজ কর্মচারীদের পরেই তালিকাগত করা হইয়াছে 'গৌড়-মালব-খশ-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চাট-ভট্ট প্রভৃতি রাজ সেবকদের। ইহাদের মধ্যে মালব, খশ, হূণ, কুলিক, কর্ণাট, লাট সকলেই অবাঙালী, মূলত ভারতীয়, কিন্তু ইতিপূর্বেই তাহারা অন্ততঃ চার পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া এদেশে বাস করিয়া ভারতীয় বনিয়া গিয়াছে। আমার ধারণা — এই সব অবাঙালী কোমের লোকেরা বাংলাদেশে আসিয়াছিল বেতনভুক সৈনিকদের রূপে, না হয় রাজসরকারে এবং নিম্নতরের কর্মচারীরূপে। ..... যে ভাবেই হউক এই সব লোকেরা ক্রমশ বাংলা দেশেরই বাসিন্দা হইয়া [illegible] গিয়াছিল এবং এ দেশেরই বিপুল জনসমুদ্রে নিজেদের বিলীন করিয়া দিয়াছিল। বাংলাদেশের জনপ্রবাহের বেগবান ধারায় কবেই ইহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।'[১]

বাঙলাদেশের এই বৈচিত্র্যের সমাবেশ ও সংমিশ্রণ কোন সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে ইতিহাস তাহার কোনো নির্দিষ্ট কালের পরিচয় দিতে পারে নাই। পণ্ডিতদের অনুমান আর্যেরা যখন সদল বলে এদেশে প্রবেশ করিয়াছে সম্ভবতঃ তাহার আগে হইতেই এই বৈচিত্র্য-এর শুরু। প্রাগ্ আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে আর্য সভ্যতার সংমিশ্রণ যখন আরম্ভ হইয়াছে তাহার পূর্ব হইতেই। তাহার পর কালে কালে বিভিন্ন জাতি আসিয়াছে বসবাস করিয়াছে বাঙলার বৈচিত্র্যের মধ্যে তাহাদের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যকে মিলাইয়া দিয়া বাঙলার সংস্কৃতিকে আরও বিচিত্রতর করিয়া তুলিয়াছে।

যতদূর জানিতে পারা যায় বাঙলাদেশের আদিম অধিবাসীরা নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এই গোষ্ঠীগুলি ছিল দ্রাবিড়, নিষাদ, শবর, পুলিন্দ, ইহাদের মধ্যেও স্থানে স্থানে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগোষ্ঠী থাকাও অসম্ভব নয়। ইহাদেরও প্রাথমিক ধরণের, যথা সকলেই যোগ, সমাজবন্ধন ব্যবস্থা ছিল। পঞ্চায়েত গঠন

১। বাঙালীর ইতিহাস — পৃঃ ৫১-৫২। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

করিয়া ইঁহারা সমাজে বাস করিত। প্রাকৃতিক ভাবেই বিস্ময় ও ভীতি - মিশ্র নানা লৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস ইঁহাদের মধ্যে দৃঢ় মূল ছিল এবং অপরদের হাত হইতে বাঁচিবার ও মঙ্গল প্রাপ্তির জন্য আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ইঁহাদের নানা ধরণের উপাসনায় ও অনুষ্ঠানে প্ররোচিত করিত। কোন কোন গোষ্ঠী বা উপগোষ্ঠী প্রবল হইয়া অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করিত এবং ক্রমশঃ ইঁহাদের মধ্যে রাজতন্ত্র (খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দী) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। রামায়ণ মহাভারত, সিংহলী দীপবংশ মহাবংশের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য থাকিলে খৃঃ পূঃ শতকে রাজতন্ত্র আর্য সম্পর্কহীন অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। যখন পূর্বাভিমুখী আর্যরা মিথিলা ও অঙ্গ পর্যন্ত আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মঙ্খলীপুত্র গোশাল প্রবর্তিত আর্য অথচ অব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী দীর্ঘ বসবাসকারী আজীবিক সম্প্রদায় উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে জাঁকিয়া বসিয়াছিল। ইঁহার পর ঐ শতকেই মহাবীর পার্শ্বনাথ যখন রাঢ় ভূমে জৈন মত প্রচার করিতে আসেন তখন তাঁহাকে যথেষ্ট দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইয়াছিল। ক্রমে জৈন মতবাদ উত্তর বঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে। গোশাল ও মহাবীর ছিলেন সমসাময়িক এবং বন্ধু ভাবাপন্ন। ইঁহার পর তৃতীয় আর্য অথচ অব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় বৌদ্ধরা খৃঃ পূর্ব পঞ্চম শতক হইতে এবং ঐ সময়েই আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের অল্প অল্প মাত্রায় অথচ সমাজচ্যুতির ভয়ে ভয়ে নিশ্চয় কোন ঐহিক লাভের আশায় বাংলার মাটিতে আসন পাতিতে থাকে। গ্রীক ঐতিহাসিকদের মতে গঙ্গা নদীর শাখার মোহনায় যে 'গঙ্গা রিডাই' রাজ্যের সুসমৃদ্ধ অবস্থার সংবাদ পাওয়া যায় তাহা হইতে অনুমান করা চলে বাংলার অন্যান্য অঞ্চল কৃষি ও শিল্পে মোটামোটি উন্নতির মুখেই ছিল এবং সেই সময়ের লোকেরা বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াই বসবাস করিত। খৃঃ পূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতকের মধ্যে আর্য ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী উত্তর পশ্চিমাগত ভারতীয়দের মধ্যে জৈনরাই সর্বাধিক আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছিল বলিয়াই মনে হয় — কারণ গোদাসগণীয় জৈন ভিক্ষুদের চারটি শাখার নাম হয় বাংলার চারটি স্থানের নামানুযায়ী।[1] বর্তমান তমলুক প্রাচীন তাম্রলিপ্ত

১। 'জৈনকল্পসূত্রের স্থবিরাবলীতে দেখা যায় ভদ্রবাহু ছিলেন প্রাচীন গোত্রীয়। তাঁহার কাশ্যপগোত্রীয় চারিজন শিষ্য। আদি শ্রুতকেবলীর ভদ্রবাহুর সেই শিষ্য চতুষ্টয়ের মধ্যে এক শিষ্যের নাম গোদাসগণী (৬০১), গোদাসগণীয় শিষ্য সন্ততির চারিটি শাখার উল্লেখ দেখিতেই পাই। তাহার প্রথম শাখা 'তামলিত্তিয়া' (তাম্রলিপ্তীয়া) দ্বিতীয় শাখা 'কোডিবরিসিয়া' (কোটিবর্ষীয়া), তৃতীয় শাখার নাম 'পোণ্ডবদ্ধনিয়া' (পৌণ্ড্রবর্ধনীয়া), চতুর্থ শাখার নাম 'দাসীখব্বডিয়া'। — (চিন্ময় দত্ত - জৈনধর্ম ও বঙ্গদেশ, পৃঃ ২৬, ক্ষিতিমোহন সেন।)

হইতে তাম্রলিপ্তিয়া, বগুড়ার নিকটবর্তী মহাস্থান গড়ের প্রাচীন নাম পুণ্ড্রবর্ধন হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনিয়া, পাহাড়পুর বাণগড়ের প্রাচীন নাম কোটীবর্ষ হইতে কোটিবর্ষিয়া। এই পাহাড়পুর দমদমা বাণগড় কোটিবর্ষেরই একজন ব্রাহ্মণ সন্তান উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া জৈনধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। এবং জৈন সাধুদের মধ্যে সুবিখ্যাত ভদ্রবাহু বলিয়া তিনি পরিচিত। এই ভদ্রবাহুই ছিলেন মগধরাজ মৌর্যচন্দ্রগুপ্তের গুরু। খৃঃ পূর্ব ৩য় শতকেই মহাস্থানগড় অর্থাৎ পুণ্ড্র নগরে প্রাপ্ত একটি খণ্ডিত শিলা ফলকের লিপি হইতে মনে হয় অন্ততঃ উত্তর বাঙলার মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতার উত্তর পশ্চিম ধারার সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়ে। খৃঃ পূর্ব ১ম শতকেই ভূমধ্য সাগরীয় যবন ও মধ্য এশিয়ার শক কুষাণরা ভারতের মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। খৃষ্টীয় ১ম শতক হইতেই বাণিজ্য ভারত সংযুক্ত হয় রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে। এর ফলে রোমের প্রচুর সোনা ভারতে আসিতে থাকে। ভারতের শিল্প বাণিজ্য ইহাতে উন্নত হয় এবং নানা স্থানে বাণিজ্যের খাতিরেই নগর বন্দর গড়িয়া উঠিতে থাকে। এই শতক হইতেই বৈদিক বিষ্ণু পৌরাণিক বিষ্ণুতে পরিণত হইয়া পূজায় ব্যাপকতা পাইতে থাকে। এই সময় হইতেই চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই সময়ের বোধিসত্ত্ব [illegible] পাকাপাকি হয় — মহাযানীরা পূর্ব ভারতে প্রধান হইয়া ওঠে। বৈদিক ধর্ম ও অনার্য সভ্যতার দান কিছু পরিমাণে গ্রহণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বা পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে পরিণত হয়। বিভিন্ন নতুন নতুন দেবদেবীর কল্পনার সূচনা হয় ব্রাহ্মণ্যমতে ও মহাযানী বৌদ্ধমতে, বাঙলা দেশেও ইহার প্রভাব আসিয়া পড়ে। আজীবিক সম্প্রদায় ক্রমশঃ কোনঠাসা হইয়া কোনো সময় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। জৈনরা আরও কয়েক শতাব্দী সক্রিয় ছিল বটে তবে দুর্বল ও ক্ষীণভাবে। প্রধান হয় ব্রাহ্মণ্য মতবাদ ও মহাযানী মতবাদ।

খৃষ্টীয় ৩য় শতক হইতে গুপ্ত সম্রাটদের প্রভাবে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম সমস্ত উত্তর ভারতে ছড়াইয়া পড়ে — মহাযানী ও ব্রাহ্মণ্য মতবাদীরা অনার্য সংস্পর্শে অধ্যাত্ম ও পারলৌকিক যাহা কিছু পাইয়া আসিতেছিল তাহার মাত্রা ধীর গতিতে হইলেও বাড়িতে থাকে। ব্রাহ্মণের সমন্বয়ী নীতি ও উপনিষদিক — সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম — মতের ভিত্তিতে। এই সময় কত অনার্য ধ্যান ধারণা যে ব্রাহ্মণ্য ধারাকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা আজ দুঃসাধ্য হইয়া গিয়াছে। মনুর সামাজিক কাঠামো আর পাণিনির সংস্কৃত ভাষা আসমুদ্র হিমাচল ভারতের বিচিত্র মানব গোষ্ঠীকে আজও একীভূত করিয়া রাখিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা ব্রাহ্মণ্য ও মহাযান উভয়েরই

গ্রহণ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য যে সমস্ত সংস্কৃতি দিয়াছে — বিচিত্র অবদানকে স্থান দিয়া আত্মীভূত করিয়াছে — বারবার তাহা পারে নাই। ব্রাহ্মণ্য অনার্য গোষ্ঠীর কাছ হইতে গাছ, পাথর, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, ধান, কলা, হলুদ, পান সুপারী, নারিকেল, সিন্দুর, কড়ি, আলপনা, গোময়, [illegible], শ্মশান-কালী প্রভৃতিকে পূজ্য বলিয়া এবং পবিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াও টিকিয়া আছে। গ্রাম দেবতার পূজা, শিশুরক্ষার পূজা, দেবদেবীর বাহন পূজা, ভূতপ্রেত, পিশাচের পূজা, ধর্মের পূজা, নীল চড়কের পূজা, মনসা ও চণ্ডীর পূজা, বিভিন্ন ব্রতানুষ্ঠান এই গুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ও আর্য — ভিন্ন জনসমাজের ধ্যানধারণার মিশ্রণ ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। উপরোক্ত পূজা, ব্রত, আচার আচরণের সঙ্গে সংযুক্ত নৃত্যগীত, কথা, কাহিনী, প্রভৃতিও পরস্পর আদানপ্রদানের মাধ্যমে সংমিশ্রিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের পূর্বেই গুপ্তদের আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া যাইতে লাগিল। সামন্ত রাজারা মাথা চাড়া দিলেন। পূর্ববঙ্গে বৈন্যগুপ্ত স্বাধীন হইয়া গেলেন। গৌড়রাজও স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়া গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব পৃথুজবীর প্রভৃতির অধীনে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল স্বতন্ত্র উত্থান করিলেন। অন্য রাষ্ট্রের আক্রমণ আসিয়াছিল বাংলার উপর। সপ্তম শতকে সমতটে খড়্গ বংশীয় রাজারা স্বাধীন হইলেন। ত্রিপুরায় শিবনাথ, শ্রীনাথ, ভবনাথ, লোকনাথ স্বাধীন হইয়াছেন। সপ্তম শতকে শশাঙ্ক গৌড় বঙ্গের রাজা। ইহার পর ভাস্কর বর্মা হর্ষ বর্ধনের বন্ধু। শিব ও বিষ্ণু সপ্তম শতকে রাজাদের পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়াছেন। অষ্টম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত উত্তর ভারতের আধিপত্যে খণ্ডিত খণ্ডিত বহু রাষ্ট্র প্রায় অনিশ্চিত অবস্থায় চলিতে থাকে।

ইহার পর পালেরা আসিয়াছে সেনরা আসিয়াছে, আসিয়াছে মুসলিমরা ইংরেজরা। বলা বাহুল্য ইহাদের আমলেও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ চলিয়াছিল। বহিরাগত রাজাদের সঙ্গে যে সমস্ত সৈন্য সামন্ত, সহযোগী, কর্মচারী আসিয়াছিল তাহার আদান প্রদানের মাধ্যমে সবসময়েই সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছে। এখনও এই মিশ্রণ ধারা থামিয়া থাকে নাই।

' নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা মত, নানাবিধ আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ে বাঙালী সংস্কৃতির জন্ম, শুধু জন্ম নয় জন্মের পরও এই নিয়মেই তার চলা। বহু মনীষার তথ্যানুসন্ধানে বাঙালী সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার স্বরূপটি আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু বাঙালী সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপকে স্বীকার করেও একথা আমরা

অস্বীকার করতে পারি না যে, বাঙলাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন উপভাষার মধ্যেই বিভিন্ন উপসংস্কৃতি বিদ্যমান।[১]

বাঙলার সংস্কৃতি মূলত অনেক কাল ধরিয়া অন্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফল।

বিশেষ কোনো দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে জানিতে হইলে প্রথমে সেই দেশের ভৌগোলিক পরিচয় জানা প্রয়োজন। দেশের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান বা ধারণা ছাড়া সেই দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি বা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন সম্ভব নহে। কারণ দেশের অবস্থান, ভূপ্রকৃতি, জলহাওয়া ও দেশের বস্তুগত রূপ বদল পরিমাণে দেশান্তর্গত মানুষের স্বভাব, সাধনা-সংস্কৃতি, আচার-বিচার বিলাস, ব্যসন, ধ্যান ধারণা সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি নির্ণয় করিয়া থাকে। সুতরাং উত্তর বাঙলার মানুষের লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য সম্পর্কে কিছু বলিবার পূর্বে দেশের বস্তুগত ভৌগোলিক পরিচয় পাওয়া অযৌক্তিক হইবে না।[২]

কোন দেশের বা রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমা বা প্রকৃতির সীমা সকল যুগে সকল কালে এক থাকে না। দেশের সীমা পরিবর্তনশীল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রসার ও সংকুচনের ফলে সেই দেশের সীমান্ত প্রসারিত ও সংকুচিত হয়। আজ আমরা বঙ্গদেশ বলিয়া যাহা অভিহিত করিতেছি সেই বঙ্গদেশের সীমান্ত যুগে যুগে কখনো সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং কখনো সংকুচিত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালের কথা আমরা সঠিক ভাবে জানিতে না পারিলেও যে যুগের প্রমাণ আমাদের হাতে আছে তাহার মধ্যেই বঙ্গদেশের পরিবর্তন নেহাৎ কম হয়নাই। ১৫৫০ খৃঃ জাও দ্য বারোসের আঁকা বাঙলা দেশের মানচিত্রে বর্তমান ও উভয় বঙ্গ ছাড়া উড়িষ্যার কিছু অংশ, বিহার, কামতাপুর রাজ্য, শিলেট, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যের নামও অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ফান্ডেন ব্রুক কৃত বাঙলার মানচিত্রে পূর্বোক্ত সীমানার অনেক সংকোচন দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৬৪-৭৬ খৃষ্টাব্দে রেনেল এর অঙ্কিত মানচিত্রে পশ্চিম দিকের সীমার কিছু প্রসার দেখা গেলেও পূর্বদিক অনেকটা সংকুচিত হইয়াছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ বিভাগের সময় বিহার ও আসাম রাজ্যেও বাঙলার মধ্যে স্থান হইয়াছে।

১। সীমান্ত বাঙলার লোকযান : পৃঃ ১৯, ডঃ সুধীর করণ।
২। বাঙালীর ইতিহাস — পৃঃ ৮৩, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

এবং সে সময় বঙ্গদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশের মানচিত্র বিভাগোত্তর বাংলাদেশকে লইয়াই সীমাবদ্ধ ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় বাংলা দেশকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বাংলাদেশের দুই তৃতীয়াংশই তাহার পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়, বর্তমানে তাহা নবগঠিত বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের অবশিষ্টাংশ যাহা ভারতযুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহা মাত্র ষোলটি জেলা ও জেলাংশ লইয়া গঠিত একটি প্রদেশ মাত্র। তাহার বর্তমান নাম পশ্চিম বঙ্গ। পশ্চিম বঙ্গের যে পাঁচটি জেলা ভূপ্রকৃতি ও অবস্থান-গত ভাবে দক্ষিণাংশের আর দশটি জেলা হইতে প্রায় পৃথক ভাবে উত্তরাংশে বর্তমান তাহার নাম বর্তমানে উত্তর বাংলা। প্রাক-বিভাগকালে গঙ্গা যমুনায়, ব্রহ্মপুত্র দ্বারা চিহ্নিত উত্তর বঙ্গ বলিতে উত্তর অঞ্চলের এক বিরাট এলাকে বুঝাইতো কিন্তু দেশবিভাগের ফলে তাহা কেবলমাত্র পাঁচটি জেলায় দাঁড়াইয়াছে।[১] এই পাঁচটি জেলা মালদহ, পশ্চিমদিনাজপুর জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহারকে লইয়া নবগঠিত উত্তর বাংলাই আমাদের বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্র।

যে পাঁচটি জেলা লইয়া গঠিত উত্তর-বাংলা আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র তাহা অবস্থানের দিক দিয়া কিছু স্বতন্ত্র। মূল পশ্চিমবঙ্গ হইতে ইহা একেবারে উত্তর প্রান্তীয় সীমায় অবস্থিত — মূল পশ্চিম বঙ্গ হইতে প্রাকৃত জলধারা গঙ্গা নদীদ্বারা বিচ্ছিন্ন। রাজনৈতিক কারণে পূর্ববঙ্গের সহিতও সম্পর্ক মুক্ত ছিল। অন্যদিকে ইহার প্রায় সর্বদিক ভিন্নরাষ্ট্র অথবা অন্য প্রদেশ ভূমিদ্বারা পরিবৃত। কাজেই বঙ্গদেশীয় সংস্কৃতির সহিত ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটিবার সুযোগ হইয়াছে প্রচুর।

১। "North of the main branch of the Ganges ,now known as the padma and west of the Brahmaputra, lies the extensive region of North Bengal which embraces the modern Rajshahi Division and the state of Cooch Behar."

History of Bengal-- D.University.

যে পাঁচটি জেলা লইয়া বর্তমান উত্তর বাংলা গঠিত তাহার কিছু অংশ এককালে বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল না । বাংলার বা বিহারের ভিন্ন ভিন্ন রাজা বা সুলতানের সঙ্গে যুক্ত ছিল । পরবর্তীকালে এই গুলি বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক বা অন্য কোন কারণে বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে । মালদহ জেলার কালিয়াচক, মানিকচক, রতুয়া ও খর্বা থানা ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল । কালিয়াচক, শিবগঞ্জ প্রভৃতি থানা অঞ্চলের দুর্বিনীতদের শায়েস্তা করিবার উদ্দেশ্যে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মালদহ জেলা গঠনের সময় তাহা বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হয় ।*

* The district was formed of outlying portions of the Purnea and Dinajpur districts in 1813 . At the time of Dr. Buchanan Hamilton (1808-9) the present thanas of Gajol, Malda, Bamangola and part of Habibpur were included in the district of Dinajpur , and the thanas of Harishchandrapur , Kharba ,Ratua, Manikchak, Kaliachak were included in the district of Purnea. The Mahananda at that time formed the boundary between Purnea and Dinajpur districts . In the year 1813 in consequence of the prevalence of serious crimes in the Kaliachak and Sibganj(Now in Pakistan) thanas and an the rivers, a joint Magistrate and Deputy Collector was appointed at Englishbazar with jusrisdiction over a number of police stations centering on that place and taken from the two districts."

---

1. District Handbooks - Malda, Page -(i) by A.Mitra.

কাজেই বর্তমানে আমরা যে ভূমি অঞ্চল লইয়া মালদহ শহরকে সংগঠিত দেখিতে পাই তাহার প্রায় অর্ধাংশ কিঞ্চিৎ অধিক দেড়শত বৎসর পূর্বে বিহার রাজ্য হইতে লইয়া বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। মালদহ জেলার এই বিহারাগত ভূভাগে এখনো বিহারী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ছাপ স্পষ্ট।

বিভাগোত্তর কালে বর্তমান পশ্চিমদিনাজপুর জেলার উপর দিয়াও কম ভূমি পরিবর্তন ও শাসন সংক্রান্ত ঝড় বহিয়া যায় নাই। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে দেশ বিভাগের ফলে দিনাজপুরের অধিকাংশ ভূমিই তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। কাজেই অবশিষ্ট অংশকে লইয়া পশ্চিমদিনাজপুর জেলা তৈরী করিতে গিয়া প্রায় ইহাকে নতুন ভাবে ঢালিয়া সাজাইতে হইয়াছে। যে তিনটি সাব ডিভিশন লইয়া পশ্চিমদিনাজপুর জেলা গঠিত তাহার অন্যতম সাবডিভিশান ইসলামপুর এই সেদিন (১৯৫৬) বিহার রাজ্য হইতে লইয়া পশ্চিমদিনাজপুর জেলার সহিত যুক্ত করা হইয়াছে।

*"In pursuance of the provisions of the Bihar and west Bengal (Transfer of Territories) Act of 1951, Some areas of Purnea district of Bihar were transferred to West Bengal . Initially the entire area was included in the district of Darjeeling by notification No.3858G.A. dated .11.56.On 2.11.56 the area was made a p rt of the district of West Dinajpur by Notification No. 3875 G.A. By Notification No.1176 G.A. dated 20.3.59. that portion of the area which lies to the north of the river Mahananda was transferred to the district of Darjeeling thms giving the district its present boundaries.

The new police station of Hilli was constituted by notification No.1150 dated the 8th May,1948. The district of West Dinajpur was formally constituted by notification No. 548 G.A. dated 23.2.48and it consist of the police stations of (i) Balurghat,(ii) Kumarganj,(iii) Gangarampur ,(iv)Tapan,(v) Raiganj,(vi)Hemtabad,(vii)Bangshihari, (viii) Kushmundi,(ix) Kaliaganj, and (x) Itahar. Notification No.2139 G.A. dated 14.7.48 formed Raiganj Sub division with the Police Stations, (1)Raiganj,(2) Hemtabad,(3)Banghihari,(4) Kushmandi,(5) Kaliganj, and (6) Itahar. At that time the district consisted of two sub-division (1) The Sadar sub division and (2) the Sub-Division of Raiganj. Consequent on the acquisition of some territories from the Purnea district

of Bihar , an additional Sub-Division of Islampur was created ....
(3) The Sub-Divison of Islampur consisting of the police stations of Chopra , Karandighi, Islampur and Goalpukhar.

Notification No.1392 p. dated 17.2.43 transferred S.L. No.185 and Nos. 187-211 of police station Kaliganj to police station Raiganj of the territory that come to the district from the district of Purnea, those portions which formarly belonged to the police stations of Thakurganj and Chopra in the Kishanganj sub division of Purnea district were constituted as a police station by notification No.3859 G.A. dated 1.11.56. Notification No. 3860 G.A. dated 1.11.56 .Similarly constituted the police station of Islampur with those area which used to form a part of the Police station of Islampur in Kishanganj sub-division Notification No.3861 G.A. constituted the police station of Goalpukhar with the areas which had formed the former police station of Goalpukhar and part of the police station of Kishanganj sub-division of the Purnea district . By Notification No.3862 G.A. that part of the former Karandighi Police station in the Katihar sub-division of the Purnea district , which had been ceded to west Bengal was constituted into the new police station of Karandighi in the Islampur Sub-Division."*

---

* District Gazetteer, West Dinajpur.

পশ্চিমদিনাজপুর জেলার এই ভূমি পরিবর্তনের পর যে বিহারের কিছু ভূমি উত্তর বাংলার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে তাহা নহে এই ভূমি অন্তর্ভুক্তির ফলে উত্তর প্রান্তের আর তিনটি জেলা দার্জিলিঙের জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের সঙ্গে দক্ষিণের মালদহ ও পশ্চিমদিনাজপুরের সংযুক্তি হইয়াছে স্বাভাবিক ।

দার্জিলিং জেলা গঠনের ইতিহাস আরও কম বিচিত্র । তদানীন্তন ইংরেজ সরকার তাহাদের কর্মচারীদের গ্রীষ্মাবাস ও স্বাস্থ্যনিবাসের সুবিধার জন্য সিকিম রাজের কাছ হইতে দার্জিলিং জেলা হস্তগত করে । দার্জিলিং জেলা গঠন ও ভূমি হস্তান্তরকরণ — সম্পর্কে জেলা গেজেটিয়ারে উল্লেখ পাওয়া যায় —

*"The History of Darjeeling Presents a late chapter in the extension of British rule, for it was not until the begining of the 19th century that the east Indi Company was brought into direct relations with the tract of country which now bears the n me . It then formed part of the dominions of Raja of Sikkim, a petty ruler who had long been engaged in an unsuceessful struggle ag inst the growing power of the warlike Gurkhas. After overrunning the hills and valleys of Nepal, they marched east into Sikkim in 1780, and during the next 30 years the country su fered repeatedly from their in roads . At the end of this period they had overrun Sikkim as far eastward as the Tista river, and had conquered and annexed the Totai , i.e, the belt of country lying along the lower hills between that river and the Mechi, which is now covered by the valuable tea gardens of the Darjeeling planters. In the meantime, the East India Company was engaged in unavailing remonstrances against the Nep lese aggressions throughout the whole length of their no thern frontier , and was finally broke out in 1813 at its close

the tract which the Nepalese had wristed from the Raja of Sikkim was ceded to the East India Company ; the Raja who had been driven out of his dominions , was reinstated ; nd in 1817 a treaty was concluded at Tilaya , under hich the whole of the country between the Mechi and the Tista, a tract extending over 4,000 square miles, was resorted to him . his covereignity being granted by the company . The intervention of the of the British was thus successful in preventing the gurkhas from turing the whole of Sikkim and the hills west and south of the Tista into and out lying province of Nepals , and Sikkim including the present district of Darjeeling was repained as a buffer state between Nepal and Bhutan ."[1]

এই ভূমি প্রদান সম্বন্ধে সিকিম রাজার যে চুক্তিপত্রে সহি করিতে হয় তাহাও এখানে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছি । —

The Governor General having expressed his desire for the possession of the hill of Darjeeling on account of its cool climate , forthe purpose of enabling the servants of his Governments , suffering from sickness , to avail themselves of its advantages, I the Sikkimputtee Raja , out of friendship for the said Govern General , hereby present

---

1. Gazettеer -- Darjeeling - Page-19.by L.S.S.O. Malley.

"Darjeeling to the East India Company, that is all the land of the Great Rungeet river. east of the Bal sor, Kahail and to little Rungeet river, and west of the Rungee and Mahananddi rivers." -

দার্জিলিংজেলা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে আসিবার পর হইতে ইহার বিশেষ উন্নতি আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতেই দার্জিলিংএর লোকবসতি বাড়িতে থাকে। এবং ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর লোকের আগমন বৃদ্ধি পায়।

ডঃ রেবতীমোহন লাহিড়ী বলিয়াছেন —' জলপাইগুড়ি জেলা কোচবিহারের কন্যা বটে — কিন্তু এ কন্যার জন্ম বহু দুঃখের মধ্যে এবং মাতার অঙ্গচ্ছেদ দ্বারা।'[২]

১৮শ, ১৯শ শতাব্দীতে যখন কোচবিহার রাজ ক্রমশঃই শক্তিহীন হইয়া পড়িতে ছিলো সে সময় ভুটিয়াদের আক্রমণ ও উপদ্রব বাড়িতে থাকে। ঐতিহাসিকেরা মনে করিয়া থাকেন ভুটিয়াদের এই আক্রমণের পেছনে কোচবিহারের জ্ঞাতি রাজা বৈকুন্ঠপুরের ইন্ধন ছিল। কিন্তু এই সময় বৈকুন্ঠপুর ও নিতান্ত নিরাপদ ছিল না। সেখানে নেপালের সামন্তদের মোরং হইতে লুন্ঠনকারীরাও অনবরত হানা দিতেছিল। এই সময়েই বৈকুন্ঠপুরে সন্ন্যাসীদের ও অনুপ্রবেশ আরম্ভ হয়। প্রতিবেশী রাজাদের পরস্পরের মধ্যে এই আত্মকলহের সুযোগ লইয়া তদানীন্তন ভারতের ইংরেজ সরকার এই অঞ্চলের উপর ক্ষমতা বিস্তার করিতে থাকে। এবং পরে এই অঞ্চল ইংরেজ সরকারের করায়ত্ত হইলে ইংরেজ সরকার প্রশাসনের সুবিধার জন্য ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে 'পশ্চিমদুয়ার অঞ্চল' গঠিত করে। ইহা তিনটি মহকুমা লইয়া গঠিত ময়নাগুড়ি, আলিপুর ও ডালিমকোট। সদর মহকুমা স্থাপিত হয় ময়নাগুড়িতে। ডালিমকোট মহকুমা অঞ্চল তিন বৎসর পর দার্জিলিং জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এবং অবশেষে ১৮৬৯ খৃঃ ১লা জানুয়ারী আলিপুর দুয়ার, বক্সা এবং ময়নাগুড়ি মহকুমার অবশিষ্ট যোগ হইল রংপুর জেলার অধীন জলপাইগুড়ি মহকুমা এবং এই ভাবে অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া তিস্তার পূর্ব ও পশ্চিম পার অঞ্চল লইয়া জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হয়।

" "The district of Western Doars was formed in 1864 after the Dooars war against Bhutan with threesub-divisions-- Sadar with headquarters at Mainaguri, Buxa with headquarters at Alipur and Dalimkote which was later transferred to Darjeeling -- all comprising the submontane tract between the Teesta and Sankos Rivers. The district of

---

Gazetteer -- Darjeeling - 1907. Page by L.S.S.O.Malley.

২। জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাস — জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ — পৃঃ ৭।

Jalpaiguri as xxxxdxixkxx administrative unit come into being on 1st January, 1869 on the amalgamation of the Western Dooars district with the Jalpaiguri Sub-Division of Rungpore (Notification of 8th December, 1868).

কোচবিহারের ভাগ্যেও কম পরিবর্তনের ঝড় বহিয়া যায় নাই। বর্তমানে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গে উত্তর প্রান্তের এক সাধারণ প্রান্তীয় জেলা হইলেও একদিন দোর্দণ্ড প্রতাপ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল। ইহার সীমা একসময় আসাম, উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীকালে এই বিরাট রাষ্ট্রই রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে ক্রমশঃ সংকুচিত ও খণ্ডিত হইয়া মাত্র একটি জেলায় পরিণত হইয়াছে। ভারত বিভাজনের সময় পর্যন্ত কোচবিহার একটি করদ মিত্র রাষ্ট্র ছিল কিন্তু ভারত স্বাধীনতার পর এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে হয় ভারতের সঙ্গে অথবা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হইতে বাধ্য করা হয়। ইহার ফলেই কোচবিহার রাজ্য তাহার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ১৯৪৯ ভারতযুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১। The Boundaries of Jalpaiguri-- By. S.P.Mallick.

২। "Cooch behar is situated on the north east of West Bengal and until January 1950 and to be a Feudatory state in political relation, first with the British Government and then with the Government of India on the 28th of August 1947 an Agreement was contracted between the Governor General of India and His Highness, the Maharaja of Coochbehar which come to be known as the Coochbehar Merger Agreement, in which His Highness the Maharaja of Coochbehar ceded to the Dominion Government (Government of India 'full and exclusive authority. Jurisdiction and powers for and in relation to the Government of the State and greed to transfer the administration of the state to the Dominion Government on the 17th day of September 1949. It was stipulayed that from the 12th September 1949 the Government of India would be competedt to govern the state in such a manner and through such a agency as it might think fit." -- District Handbooks, Cooch Behar, 1951-pp-(1) by A.Mitra.

ভারত সরকার প্রশাসনিক সুবিধা জন্য ইহাকে পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করে এবং সেই হইতেই কোচবিহার পশ্চিমবাংলার একটি জেলা মাত্র। ক্ষমতা হস্তান্তরীকরণের সময় একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।[১]

***   ***   ***   ***

আজ যে পাঁচটি জেলা লইয়া বর্তমান উত্তর বাংলা গঠিত তাহার গঠন ও উৎপত্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল। আলোচনার শেষে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, যে ভূখণ্ড লইয়া বর্তমান উত্তর বাংলা সংগঠিত তাহার সমগ্র ভূমি বাংলা দেশের অন্তর্গত ছিল না। এইগুলি বাংলার বাহিরের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র, রাজ্য বা প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। — মালদহ জেলার কালিয়াচক, মানিকচক, রতুয়া থানা ও খর্বা থানা বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মালদহ জেলা গঠনের সময় তাহা বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়)। পশ্চিমদিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমাকে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে বাংলাভুক্ত করিয়া পশ্চিমদিনাজপুর জেলার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার পূর্ব পর্যন্ত ইসলামপুর বিহার প্রদেশের পূর্ণিয়া জেলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। দার্জিলিং জেলার দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং মহকুমাগুলি অর্থাৎ সমগ্র পাহাড় অঞ্চল ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত যে ছিল ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। ইংরাজ শাসকেরা তাহা প্রথম বাংলার অধীনে আনেন। সমগ্র কোচবিহার জেলা ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ভারতভুক্তির পূর্ব পর্যন্ত স্বতন্ত্র কোচবিহার রাজবংশ শাসিত হইত এবং তাহারও পূর্বে সম্পূর্ণ কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশ বিশাল কামতাপুর রাজ্যের অধীন ছিল। তখন কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি অঞ্চল বিরাট কামতাপুর সংস্কৃতির দ্বারা যে চালিত হইত তাহার প্রমাণ আজও এই অঞ্চলে স্পষ্ট। উল্লিখিত অঞ্চলগুলিতে বাংলা দেশের অন্তর্ভুক্তির আগে যে যে দেশের অধীন ছিল সেই সেই দেশের সমাজ-সংস্কার, সংস্কৃতি

১ "It is hereby agreed as follows :-

Article --1, -- His Highness the Maharaja of Coochbehar hereby cedes to the Domönion Government full and exlusive authority ,jurisdiction and powers for and in relation to the ~~government~~ governance of the state and agreed on to the transfer the administration of the state to the Dominion Government on the 12th day of September, 1947."

-- District Handbook, Coochbehar, page-   by A.Mitra.

73876
23 MAR 1981
UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

ও ভাষার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ফলে এখনও ঐ ঐ অঞ্চলগুলিতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সংস্কৃতি, সংস্কার ও ভাষার ছাপ খুব স্পষ্ট। দার্জিলিংএর পাহাড় অঞ্চলের প্রচলিত প্রধান ভাষা নেপালী। কোচবিহার লোকসাধারণের ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার লক্ষণ যতটা পাওয়া যায় কামরূপী বা অসমীয়া ভাষার বৈশিষ্ট্য তাহার চাইতে কিছু কম নয়। মালদহের দক্ষিণ পশ্চিম ও পশ্চিম দিনাজপুরের জেলার ইসলামপুর মহকুমার লোক ব্যবহৃত ভাষা হিন্দি ও রাজবংশী হইতে সৃষ্ট এক মিশ্রিত উপভাষা মিশ্র বাংলা ভাষা, গ্রীয়ার্সনের মতানুযায়ী যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে 'সিরিপুরিয়া' ভাষা*। তেমনি সংস্কৃতির দিক থেকে কোচবিহার দার্জিলিং, ইসলামপুর ও মালদহের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে যথাক্রমে আসাম নেপাল, ভুটান ও বিহারের প্রভাব খুব বেশী এবং ব্যাপক। যেহেতু লোকসাহিত্য লোক সমাজ হইতে সৃষ্ট হয় তাহাই উত্তর বাংলায় লোক সাহিত্যের উপর উপরিউক্ত দেশগুলির সমাজ সংস্কৃতি ভাষা এবং জনজীবনের প্রভাব নেহাৎ কম নয়। এই সব লোক সমাজেও এমন কোন কোন লোকসাহিত্যের ধারার আলোচনা এই নিবন্ধে করা হইয়াছে যে গুলি বাংলার বাহির হইতে এই দেশে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আবার কোন কোন ধারা বাহিরের কোন সঙ্গীত সাহিত্যের ধারার সঙ্গে সংযুক্ত নূতন ধারার সৃষ্টি করিয়াছে।

ঐতিহাসিক ও গবেষকদের গবেষণার ফলে এ তথ্য আজ সুস্পষ্ট যে বঙ্গদেশে আর্যজনপ্রবেশ উত্তর বাংলা হইতেই শুরু হইয়াছিল। মগধ ও মিথিলার মধ্য দিয়া আর্যরা ক্রমানুয়ে উত্তর বাংলায় তাহাদের বসতি গড়িয়া তোলে এবং বসবাস আরম্ভ করে। সেই সময় হইতেই উত্তর বাংলায় আর্য সংস্কৃতির প্রভাব ও বিস্তার ঘটিতে থাকে।

১।(ক) 'পশ্চিম বঙ্গের লোক সংস্কৃতি' — বিনয় ঘোষ।

(খ) 'প্রাচীন বাংলার প্রাচীন সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ও বিস্তৃতিলাভ হয় এই উত্তরবঙ্গে। উত্তরাপথের পথ বেয়ে আর্যেরা নাকি এই অঞ্চলে এসে প্রথম তাঁদের বসবাস আরম্ভ করেন। কোন কোন পণ্ডিত এমনও মনে করেন যে, আর্যেরা প্রথম উত্তরবঙ্গে এবং পরে ধীরে ধীরে রাঢ়ের ভাগীরথী দামোদরের তীর অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেন, বাংলার অন্য সমস্ত অঞ্চল তখনো আর্যেতর মানুষের আবাসস্থল ছিল।'

রাজশাহীর কথা — ভূমিকা, পৃষ্ঠা — ২০।

অধ্যাপক আনসারীর জলীল।

* The Linguistic Survey of India - Vol-V, G. A. Grierson.

পরে দীর্ঘদিন ধরিয়া উত্তর বাঙলা বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী বা জন সমাজের লোক ঐ সমস্ত রাজা বাদশাদের ঘিরিয়া এই উত্তর বাঙলায় জনবসতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। কারণ রাজপরিবার ও রাজধানীকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন রাজ্যোপজীবীরা [redacted] বিভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া বসবাস করিয়া থাকে। এবং পরে [redacted] তাহারাই সেই অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া পড়ে। কাজে সেই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উত্তর বাঙলায় যে জন সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে বিভিন্ন সংস্কৃতির ও ভাষার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

ইহা ছাড়া বহিরাগত পরাক্রান্ত রাজাবাদশারা যখন এই দেশ জয় করিয়া এখানে রাজত্ব করিয়াছে তখন তাহাদের সঙ্গে আগত সৈন্য সামন্ত অনুচর কর্মচারীরাও তাহাদের সঙ্গে আসিয়া এই দেশে বসবাস আরম্ভ করিয়াছে। এবং তাহারা দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে এই দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের সংস্কৃতি মিশাইয়া ফেলিয়াছে। এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে।" বাংলার বাহিরের অনেক রাজবংশের পরাক্রান্ত রাজারা সৈন্যসামন্ত লইয়া বহুবার বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছেন, কখনো কখনো জয় করিয়াছেন, এবং তাহার পর বিজয়গর্ব লইয়া, বহু কিছু উর্ধ্ব লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। সৈন্যসামন্ত ইত্যাদি সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ প্রভুর সঙ্গেই ফিরিয়া গিয়াছে। কিছু যাহারা স্থায়ী বাসিন্দা রূপে বাংলায় থাকিয়া গিয়াছে তাহারা জনসমুদ্রে জলবিন্দুবৎ কোথায় যে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহার কোনও হিসাব নাই। ইহা ছাড়া, পাল ও সেনরাজাদের পট্টোলী-গুলিতে এবং সমসাময়িক বাংলার অন্যান্য লিপিতে দেখা যায় অনেক অবাঙালী ভারতীয় কোম-উপজাতির উল্লেখ। ভূমিদান-বিক্রয়ের পট্টোলীগুলিতে দান বিক্রয় যাহাদের নিকট বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে, সেখানে বিভিন্ন রাজকর্মচারী, স্থানীয় সকল প্রধান ব্যক্তি ইত্যাদির পরই নাম করা হইতেছে নানা কোম-উপজাতির। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মদনপালের মনহলি পট্টোলীর তালিকাটি উদ্ধার করা যাইতে পারে, রাজকর্মচারীদের পরই তালিকাগত করা হইয়াছে (গৌড়-মালব-চোড়-খশ-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চাট" প্রভৃতি রাজসেবকদের। ইহাদের মধ্যে মালব, চোড়, খশ, হূণ, কুলিক, লাট সকলেই অবাঙালী, হূণেরা তো মূলত অভারতীয়, কিন্তু ইতিপূর্বেই তাহারা অন্তত চার পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া এদেশে বাস করিয়া ভারতীয় বনিয়া গিয়াছে। আমার ধারণা — অন্যত্র এ ধারণার কারণ বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। — এই সব

ভোটভাষী ভোটের লোকেরা বাংলা দেশে আসিয়াছিল যেমন তিব্বতী সৈনিকবৃন্দ, নায়েব রাজকর্মচারী এবং বিভিন্ন কর্মচারীবৃন্দ।"১

উত্তর বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান এমন যেখানে বহিরাগত ভোটভাষী এমনকি অন্যান্য জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশের পক্ষে অনুকূল হইয়াছে। উত্তর বাংলার অবস্থানগত এই অনুকূল বৈশিষ্ট্যের জন্য এখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ বারবার ঘটিয়াছে।

ইতিহাস প্রমাণ দেয় আর্যদের এদেশে অনুপ্রবেশ ঘটিবার পূর্বেই এদেশে কয়েকটি জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। আর্যদের চামড়ার রং শুভ্র ছিল। কিন্তু অনার্যদের চামড়ার রং কৃষ্ণ হইলেও ইহাদের একটা নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল। এবং তাহাদের সেই সমস্ত সভ্যতা অনেকের মতে আর্যদের চাইতেও উন্নত ছিল। একজন লেখক এই সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন —"The Aryan attitude to the Austric and Dravidian people was not friendly. No brotherly behaviour was seen in them. They were proud of their fair complexion and they hated the other groups for their black colour. But we should always remember that culturally they were not so rich, as they were a nomadic people The Dravidian and the Austric people knew how to cultivate land and get food to live on. The Aryan did not know this at all."২

কিন্তু আর্যরা এই সমস্ত অস্ট্রিক, দ্রাবিড় প্রভৃতি আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠীদের যতই ঘৃণা করুক না কেন — ইহাদের কাছ হইতে তাহাদের নিতে হইয়াছে অনেক।" The major portion of the culture customs and superstitions of the so called Aryan people have been taken from the Austric."৩

১। বাঙালির ইতিহাস — পৃষ্ঠা, ৫১-৫২, ডঃ নীহার রঞ্জন রায়।

২। Sudhir Kumar Bhowmick -- Bulletin of the Cultural Institute, Pp84.

৩। -do- -do -do-

প্রাক্‌ আর্য সভ্যতার সঙ্গে আর্যসভ্যতার সংমিশ্রণ ও প্রভাব সম্পর্কে বলিতে গিয়া ডঃ নীহার রঞ্জন রায় যাহা বলিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। –' বিশেষ বিশেষ ফলমূল-ফুল সম্বন্ধে যে-সব বিধি-নিষেধ আমাদের মধ্যে প্রচলিত, যে সব ফলমূল আমাদের পূজার্চনায় উৎসর্গ করা হয়, আমাদের মধ্যে যে নবান্ন উৎসব প্রভৃতি করিয়া থাকেন, ইত্যাদি, বস্তুত, আমাদের দৈনন্দিন অনেক আচার-অনুষ্ঠানই এই আদিম অস্ট্রিক-ভাষাভাষী জনদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। একটু লক্ষ করিলেই দেখা যাইবে, ইহাদের অনেকগুলিই কৃষি ও প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। আমাদের নানা আচার-অনুষ্ঠানে, ধর্ম, সমাজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আজও ধান, ধানের গুচ্ছ, দূর্বা, কলা, হলুদ, সুপারি, নারিকেল, পান সিন্দুর, কলাগাছ প্রভৃতি অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। লক্ষণীয় এই যে ইহার প্রত্যেকটিই অস্ট্রিক-ভাষাভাষী জনদের দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ"[1]। এই আলোচনার মধ্য দিয়া ডঃ রায় প্রমাণ করিয়াছেন যে বাঙালীর বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে প্রাক্‌ আর্য জনগোষ্ঠীর দান কম নহে। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও এই মত সমর্থন করেন।[2]

প্রাগ-আর্য জন সংস্কৃতির সঙ্গে আর্য সংস্কৃতির যে সংমিশ্রণ ঘটিয়া ছিল সেই সংস্কৃতি সেই খানেই দাঁড়াইয়া থাকে নাই। ইহার সমসাময়িক সময়ে অথবা পরবর্তীকালে আরও ও যে সমস্ত জনগোষ্ঠী বিভিন্ন দিক দিয়া উত্তর বাংলায় অথবা বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া ছিল তাহাদের ও দান উত্তর বাংলার সভ্যতা, ভাষা ও সংস্কৃতিতে তুচ্ছ নয়।

মালপাহাড়ী নামে একটি ছোটো সম্প্রদায়ের দেখা পাওয়া যায় উত্তর বাংলার মালদহ, জলপাইগুড়ি পঃ দিনাজপুর জেলায়। ইহারা বর্তমানে উত্তর বাংলার কোনো কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হইলেও ইহারা বহিরাগত জন গোষ্ঠী। নানা কারণে মালপাহাড়ীরা তাহাদের আদি ভূমি রাজমহল, পাকুড়, সাঁওতাল পরগনা প্রভৃতি স্থান ছাড়িয়া বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যে সমস্ত মালপাহাড়ী উত্তর বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে তাহারা নিজেদের পূর্ব পুরুষাগত সংস্কৃতিকে পুরোপুরি বজায় রাখিতে পারে নাই। তাহাদের ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি আজ বহু পরিমাণে উত্তর বাংলার সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছে। অন্যদিকে তাহাদের [illegible] সংস্কৃতি, বা ভাষা শব্দ যে উত্তর বাংলার জন সংস্কৃতি ও ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে নাই তাহা কেহ হলপ করিয়া বলিতে পারিবে না। একজন গবেষক আগত মালপাহাড়ী

মালপাহাড়ীদের সম্পর্কে বলিতে গিয়া উল্লেখ করিয়াছেন —

"These people are not the autochthons of this state, but were the original inhabitants of Behar. Due to hard internal and /or external pressure, they migrated a few decade ago as labourers in tea garden areas in North Bengal as tea plantation labourers and in the plain areas as ordinary day labourers, and gradually started settling here permanently. Their migration was mainly from Rajmohal, Pakur and Godda areas of Santal Parganas in Bihar. In the northern part of West Bengal they settled permanently as tea ~~xkaxkiox~~ plantation labourers .... Due to this migration far away from their home-land and due to settling here permanently in the new environment the ethno-cultural link with the congeners of their paternal land gradually became thinnen and thinner and as a result of this, they started building up a new cultural and social pattern quite district from their original homeland. This is mainly due to the influence of the new envirionment with more advanced culture."[১]

প্রকৃতপক্ষে এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তর বাংলায় আরো আছে লোধা, খড়িয়া ওরাওঁ, সাঁওতাল, ধাঙ্গড়, কোনাদ, মুশাহার, বাগদি, বাদিয়া, ভূঁইমালী, ভূঁইয়া, মাহালী, বিন্দ, কাউট, পাটনী, মেথর, কোচ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ছোট এবং বড় জনগোষ্ঠী। ইহাদের কোন কোন সম্প্রদায় উত্তর বাংলার সর্বত্র ছড়াইয়া আছে আবার কোনো কোনো সম্প্রদায় কেবল মাত্র কোন বিশেষ জেলা বা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। যেমন সাঁওতাল, কোচ, মালপাহাড়ী, ওরাওঁ প্রভৃতি সম্প্রদায় উত্তর বাংলার পাঁচ জেলাতেই কম বেশী ছড়াইয়া আছে দেখা যায়। আবার তেমনি অপর দিকে যেমন মালপাহাড়ীরা মালদহ ও জলপাইগুড়ি জেলাতেই অধিক বসবাস করিয়া থাকে। টোটোরা কেবলমাত্র জলপাইগুড়ি জেলার একটি বিশেষ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ।

১। The Malpahariss of West Bengal -- by A.K. Das, B. Roy Chowdhury and M.K. Raha.

কিন্তু একথা আজ প্রমাণিত যে ইঁহারা সংখ্যায় কম বা বেশী যাহাই হোক না কেন যেহেতু ইঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া বংশানুক্রমে পরস্পর পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছে অতএব তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিনিময় ঘটিয়াছে। তাই প্রাগ্‌আর্যদের মধ্যে যেমন তাহাদের সংস্কৃতির বিনিময় দেখা যায় তেমনি সংস্কৃতির বিনিময় দেখা যায় আর্য অভিহিত বর্ণ হিন্দুদের ধর্ম সংস্কৃতিতেও।

এই প্রাগ্‌আর্য আদি জনগোষ্ঠী ছাড়া আর একটি বিরাট গোষ্ঠীর জনধারার সন্ধান পাওয়া যায় উত্তর বাংলায়। ইঁহারা ইন্দোমঙ্গোলীয় গোষ্ঠী নামে পরিচিত। ইঁহারা কখন বা কোথা হইতে উত্তর বাংলায় অনুপ্রবেশ আরম্ভ করে ইতিহাসে তার সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে অতি প্রাচীন কালেই যে এই অনুপ্রবেশ শুরু হইয়াছিল তাহা জনবিজ্ঞানীরা অনুমান করিয়া থাকেন। উত্তর পূর্ব দিক হইতে ইঁহাদের আগমন হইয়াছিলো — সম্ভবতঃ ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া ইঁহারা এই দেশে আগমন করে। পরে এই ইন্দোমঙ্গোলীয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন শাখা উপশাখার সৃষ্টি করিয়াছে। যদিও আজ তাহারা বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত তবুও তাহাদের রং দেহের গঠন, চুল, চোখ প্রভৃতি দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায় যে অতীতে ইঁহারা একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলো। ইঁহারা যে মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর লোক তাহার প্রমাণ ইঁহাদের চ্যাপ্টা নাক, উঁচু গণ্ডাস্থি, বঙ্কিম চক্ষু, উষ্ণ কেশ এবং লোমবিহীন দেহ ও মুখমণ্ডল। ইঁহারা দক্ষিণ-পশ্চিম চীন হইতে ক্রমশ ক্রমশ, ব্রহ্ম উপদ্বীপ ও পূর্ব দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী দেশ ও দ্বীপপুঞ্জে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পরে উত্তর-পূর্ব আসামে এবং উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মিরি, নাগা, বোড়ো, মেচ প্রভৃতি লোকদের মধ্যে এবং কোচ, পলিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি লোকদের ভিতর ইঁহাদের একটি ধারা আজও পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

ইন্দোমঙ্গোলীয় এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা সাধারণতঃ 'কিরাত জন' বলিয়া পরিচিত। এই 'কিরাতজন' সম্পর্কে বলিতে গিয়া জাতীয় অধ্যাপক বিখ্যাত ভাষা ও জনতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে হুবহু উদ্ধৃত করা হইল — "

"If the assumption is warranted that the Lucchavis ,Koliyas and Vajjis or Urjjs of North Bihar in the 6th century B.C. were of Indo-Mongloid origin, pure or mixed , then it is quite easy to think

"of North Bengal as much as Assam as having an Indo-Mongloid population from quite early times. Brahman nd other western Hindu settlements in North Bengal appear to have been Scanty , nd it has been mainly during the recent centuries that Brahmanas and caste Hindus have felt attracted to North Bengal districts like Jalpaiguri , Dinajpur , Rangpur and the state of Koch Behar . The masses of the North Bengal areas are very larglely of Bodo origin, or mixed Austric-Dravidian-Mongloid , where groups of peoples from lower Bengal and Bihar have penetrated among them . They can now mainly be described as Koch i.e., Hinduised or semi-Hinduised Bodo who have abandoned their original Tibets Burman speech and have adopted the Northern dialect of Bengali(which has a close affinity with Assamese)"

কিরাত গোষ্ঠী বা পার্বত্য জনসাধারণের লোকদের উত্তর বাংলার উত্তর প্রান্তের তিনটি জেলাতেই অধিক দেখা যায়। দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার এই তিনটি জেলা প্রধানতঃ পার্বত্য লোকদের দ্বারা অধ্যুষিত। কোচ, মেচ, রাজবংশী, টোটো, ভোট ইহারা সকলেই একই গোষ্ঠীর শাখা-উপশাখা। পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ জেলাতে ইহাদের সংখ্যা ক্রমশ কমিয়া আসিয়াছে।

উপরে যে সমস্ত উত্তর বাংলার জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করা হইল তাহারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশ হইতে উত্তর বাংলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা নিজ নিজ পূর্বতন বাসভূমি হইতে নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি এবং লোকাচার লইয়া আসিয়াছিল কিন্তু দীর্ঘদিন উত্তর বাংলার পরস্পরের সান্নিধ্যে বসবাস করিবার ফলে প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু সংস্কৃতির বিনিময় হইয়াছে এবং এই বিনিময়ের ফলেই উত্তর বাংলায় এক বিচিত্র

---

1. Kirata.jana-Kriti- Page-60. by .Dr. Suniti Kumar Chatterjee.

মিশ্র ভাষা সংস্কৃতির জন্ম হইয়াছে। Arthur Jules Dass তাঁহার দার্জিলিং জেলার গেজেটিয়ার গ্রন্থে জেলার জনগোষ্ঠী ও তাহা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন — "Babel of Tribes and nations." এর এই কথাটি শুধুমাত্র দার্জিলিং জেলার ক্ষেত্রে নয় সমগ্র উত্তর বাঙলার ক্ষেত্রেই তাহা সার্থক ভাবে প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়।

উত্তর বাঙলার জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আমরা দেখিতে পাইলাম যে উত্তর বাঙলায় আজ যাহারা বসবাস করিতেছে তাহাদের রক্তধারা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এই সমস্ত জনগোষ্ঠী, জনতত্ত্ব ও জনকৃষ্টি লইয়া অনেক বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে।[১]

১। গ্রন্থ : গ্রন্থকার : প্রকাশকাল :

(১) ইস্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ার : ফ্রান্সিস ওয়াল্টার হ্যামিল্টন বুকানন — ১৮১৫ খৃঃ
(২) হিস্ট্রি এন্টিকুইটি টপোগ্রাফি
অ্যাণ্ড স্ট্যাটিস্টিক্স অব ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া : মন্টোগোমারী মার্টিন : ১৮৩৮ ,,
(৩) এসে অন কোচ বোডো অ্যাণ্ড ধীমল ট্রাইবস্ : বি.এইচ.হডসন : ১৮৪৭ ,
(৪) ডেসক্রিপ্টিভ এথনোলজী অব বেঙ্গল : কর্ণেল ডাল্টন : ১৮৩৮ ,,
(৫) স্টাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল : উইলিয়াম হান্টার : ১৮৭৫ ,,
(৬) দি ট্রাইবস্ অ্যাণ্ড কাস্টস অব বেঙ্গল : এইচ.এইচ.রিজলী : ১৮৯১ ,,
(৭) সার্ভে অ্যাণ্ড সেটেলমেণ্ট
অব দি ওয়েস্টার্ণ ডুয়ার্স ইন দি ডিস্ট্রিক্ট অব
জলপাইগুড়ি : ডি.এইচ.ই. স্যাণ্ডার ১৮৯৫ ,,
(৮) লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া : স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন : ১৯২৭ ,,
(৯) কিরাত জন কৃতি : ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় :
(১০) রাজবংশীয় ও নর্থ বেঙ্গল : ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল ১৯৬৫ ,,
(১১) উত্তর বঙ্গে রাজবংশী সমাজে
দেবদেবী ও পূজাপার্বন : ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায় : ১৯৭২ ,,

কাজেই সে সম্পর্কে আর গভীর আলোচনায় গিয়া লাভ নাই। তবে কোন দেশের লোক সাহিত্য বুঝিতে হইলে সেই অঞ্চলের জন গোষ্ঠী ও লোক সমাজ সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া উপরের এই আলোচনা করা হইল।

দ্বিতীয়তঃ এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা এখনো উত্তর বাংলার লোক সমাজের সংখ্যা গরিষ্ঠ এবং যেহেতু লোক সাহিত্য লোকায়ত সমাজ হইতেই সৃষ্টি হয় সেই জন্য লোক সাহিত্যের পশ্চাদভূমি হিসাবে লোক সমাজ তথা এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর কিছু আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

***　　***　　***　　***

উত্তর বাংলার জনতত্ত্বের আলোচনা যে পরিমাণে হইয়াছে লোক সাহিত্য লইয়া সে তুলনায় প্রায় কিছুই হয় নাই। উত্তর বাংলার লোক সাহিত্য লইয়া কোন কাজ বা আলোচনা না হওয়ায় এই দিকটা এখনও প্রায় লোকচক্ষুর আড়ালে থাকিয়া গিয়াছে। সেই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে উত্তর বাংলার লোক সাহিত্য লইয়া কাজ করিবার বিরাট সুযোগ রহিয়াছে। উত্তর বাংলার লোক-সাহিত্য উত্তর বাংলার জনগোষ্ঠীর মতোই বিচিত্র।

প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে লোকসাহিত্য লইয়া কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এ দেশীয় এবং বিদেশীয় বহু গবেষকই বাংলার লোকসাহিত্য লইয়া কাজ করিবার বিরাট সুযোগ রহিয়াছে। উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য উত্তর বাংলার জনগোষ্ঠীর মতোই বিচিত্র।

প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে লোকসাহিত্য লইয়া কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এ দেশীয় এবং বিদেশীয় বহু গবেষকই বাংলার লোকসাহিত্য লইয়া কাজ করিয়াছেন। প্রথমে বিদেশীয় গবেষকেরাই আমাদের দেশের লোক সাহিত্য সংস্কৃতি লইয়া কাজ আরম্ভ করেন। পরে আমাদের দেশের গবেষকেরা এ বিষয়ে গবেষণার কাজে আগাইয়া আসেন। গবেষকেরা প্রত্যেকেই বাংলার লোক সাহিত্যের উপর কিছু কিছু সুষ্ঠু আলোচনা এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের কাজই খণ্ড বিচ্ছিন্ন। যেন বাংলার বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনার সময় লোকসাহিত্যের কথা প্রসঙ্গক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। কেবলমাত্র বাংলার লোকসাহিত্য লইয়া সামগ্রিক ভাবে আলোচনায় কেহই প্রবৃত্ত হন নাই।

বাঙলার লোক সাহিত্য লইয়া সর্ব প্রথম সামগ্রিক ভাবে কাজ আরম্ভ করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন লোক সাহিত্য বিশারদ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনি তাঁহার অধ্যাপক জীবনের শুরুতেই বাঙলার লোক সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন [illegible] এবং তখন হইতেই বাঙলার লোক সাহিত্যের সংগ্রহ আলোচনা ও গবেষণার দ্বারা বাঙলার লোকসাহিত্যকে [illegible] পূর্ণ ও সমৃদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন। তাহার অধ্যাপনা কালে জীবনের শুরুতেই লোকসাহিত্যের যে সংগ্রহ ও আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন জীবনের বার্ধক্যে পৌঁছাইয়াও তাঁহার লোকসাহিত্য বিষয়ে সংগ্রহ, প্রচার এবং আলোচনার আগ্রহ ও উৎসাহ বিন্দুমাত্র কমে নাই। তিনি এই বয়সেও বাঙলার লোকসাহিত্য, লোক সংস্কৃতির বহির্বিশ্বে প্রচারের জন্য যে প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করিতেছেন তাহা চিরদিন প্রশংসার যোগ্য হইয়া থাকিবে। লোক-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার এই আগ্রহ এবং লোকসাহিত্যের সংগ্রহ ও প্রচারে তাঁহার এই [illegible] অনলস প্রচেষ্টা বাঙলার লোক সাহিত্যের গবেষকেরা চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিবে।

উত্তর বাঙলার লোকসাহিত্যের আলোচনায় নামিয়া যাঁহার কথা সর্বপ্রথম মনে পড়ে তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অধ্যাপক ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত নাটক আকাদেমির রত্ন সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি [illegible] গবেষণা পরিষদের প্রধান ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়। শ্রদ্ধেয় ডঃ ভট্টাচার্য তাঁহার দীর্ঘদিনের পরিশ্রম লব্ধ গবেষণা গ্রন্থ 'বাংলার লোকসাহিত্য' পুস্তকের এ পর্যন্ত ছয়টি খণ্ডে বঙ্গদেশের লোক সাহিত্যের নানা দিক লইয়া যে বিস্তৃত ও সুগভীর আলোচনা এবং সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। এবং তাঁহার এই সংগ্রহ কার্য এখনও অব্যাহত আছে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই ধরণের সুবৃহৎ এবং সুমহান কাজের দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু একটু বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ করিলে দেখা যাইবে তাঁহার এই বিরাট পুস্তকের সুবিপুল সংগ্রহে পূর্ববঙ্গ এবং দক্ষিণ বঙ্গের লোক সাহিত্য যে পরিমাণ স্থান পাইয়াছে এবং যে সম্পর্কে তিনি যতটা বিশদ আলোচনা করিয়াছেন সেই তুলনায় উত্তর বাঙলার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ অপূর্ণতা থাকিয়া গিয়াছে। উত্তর বঙ্গের লোক সাহিত্যের আলোচনা সম্পর্কে ডঃ ভট্টাচার্যের কথঞ্চিৎ অপূর্ণতাই আমাদের উত্তর বাঙলার লোক সাহিত্য বিষয়ে কাজ করিবার সুযোগ ও উৎসাহ যোগাইয়াছে। এবং উত্তর বাঙলার

লোকসাহিত্য লইয়া কাজ করিতে উৎসাহ যোগাইয়াছে তাঁহার অনুপ্রেরণা।[১]

ডঃ ভট্টাচার্য ছাড়া শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব মহাশয় তাঁহার 'বাংলার পল্লীগীতি' নামক পুস্তকে উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা ও সংগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু তাহা নানা কারণে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হইয়া উঠিতে পারে নাই। চিত্তরঞ্জনবাবু পূর্ববাংলার লোকগীতির আলোচনায় না গিয়া উত্তর বাংলার কিছু কিছু লোকসংগীত লইয়া আলোচনা করিয়াছেন মাত্র।

সম্প্রতিকালে প্রকাশিত (১৯৭০) শ্রীসুশীলকুমার ভট্টাচার্যের 'উত্তর বঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি' নামক বইটিতে তিনি উত্তর বাংলার লোকসাহিত্যের সংগ্রহ এবং আলোচনা করিতে চাহিয়াছেন কিন্তু সংগ্রহের সঙ্কীর্ণতায় এবং বিশদ আলোচনা করিতে চাহিয়াছেন কিন্তু সংগ্রহের সঙ্কীর্ণতায় এবং বিশদ আলোচনার অভাবে তাহা সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার আলোচনা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে না যাইয়া আবেগ ও উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হইয়াছে। কাজেই উত্তর বাংলার লোকসাহিত্যের সামগ্রিক এবং আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা তাহার দ্বারা করা সম্ভব হয় নাই। উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য সেই অর্থে এখনও সংগ্রহ ও আলোচনার বাহিরে রহিয়া গিয়াছে। কাজেই উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য লইয়া বিস্তৃত কাজ করিবার যথেষ্ট সুযোগ থাকিয়া গিয়াছে।

ইহা ছাড়া উত্তর বাংলার লোকসাহিত্যের উপর সামগ্রিক আলোচনামূলক কোন বই প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। এখানে সেখানে বিচ্ছিন্ন ভাবে কোন কোন বিষয়ের উপর ছোট বড় কিছু কিছু প্রবন্ধ রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। লোকসাহিত্যের কোন বিশেষ শাখার উপর পুস্তক পুস্তিকাও দুই চারিটি প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু সেইগুলির কোনটিতেই উত্তর বাংলার লোকসাহিত্যের সামগ্রিক আলোচনা নাই। যথা স্থানে প্রসঙ্গক্রমে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

১। কয়েক বৎসর পূর্বে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন লোকসাহিত্য বিশারদ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে উত্তর বাংলার লোকসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি উত্তর বাংলার লোকসাহিত্যের গুরুত্ব, সংগ্রহ ও আলোচনার সুযোগের কথা উল্লেখ করিয়া বর্তমান লেখককে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এবং উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য লইয়া গবেষণা করিবার অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে গবেষণাকালে তিনি নানা ভাবে আলোচনা করিয়া এবং পত্রের দ্বারা উপদেশ, নির্দেশ এবং উৎসাহ দিয়াছেন সব সময়।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাই আমাদের উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য বিষয়ক গবেষণায় অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে তাঁহার উৎসাহ-ই আমাদের এই কাজে আগ্রহ জন্মাইয়াছে এবং সংগ্রহ ও আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে।

উত্তর বাংলার ভূ-প্রকৃতি একটু বিচিত্র— এখানে একদিকে যেমন আছে বাংলাদেশ সুলভ অফুরন্ত চিরসবুজ বিস্তীর্ণ সমতলভূমি তেমনি অপর দিকে আছে হিমালয়ের পাদদেশ পূবাদি অধ্যুষিত জনপদ ও বনভূমি। একদিকে যেমন আছে নৌচলাচলযোগ্য শান্ত প্রশান্ত সলিলা নানা নদী তেমনি আছে সদ্য পাহাড় থেকে নামা প্রচণ্ড প্রখর খরস্রোতা নদীর ভয়ঙ্কর জলধারা। একদিকে আছে গো-চারণ যোগ্য জঙ্গলহীন তৃণক্ষেত্র অপর দিকে তেমনি আছে শ্বাপদ সঙ্কুল গভীর অরণ্যানী। আর আছে প্রায় সমগ্র উত্তর বাংলা বিশেষতঃ জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, সমতল দার্জিলিং অঞ্চল জুড়িয়া তিস্তা, করতোয়া, রায়ডাক, তোর্সা, মহানন্দা প্রভৃতি নদী অববাহিকা জাত বিস্তৃত ভাওয়া প্রান্তর। এই গভীর অরণ্যানী, গো-চারণের তৃণ ভূমি, খরস্রোতা নদীখাত, নানা নদীপথ, পাহাড়ী চড়াই উৎরাই, বিস্তীর্ণ ভাওয়া-প্রান্তর উত্তর বাংলার জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। উত্তর বাংলার জনজীবনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে ইহারাই। এই প্রাকৃতিক গঠন ও প্রকৃতির উপরেই অনেকটা নির্ভরশীল তাহাদের জীবনযাত্রা, চাওয়া-পাওয়া, দেওয়া-নেওয়া, ভয়ভীতি ও আনন্দস্ফূর্তি। উত্তর বাংলার লোকস্তরের ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতিই গড়িয়া উঠিয়াছে আঞ্চলিক প্রাকৃতিক গঠন ভয়ঙ্করতা ও প্রশান্ত নির্জন প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া। ইহাদের অনেক সাহিত্য সংস্কৃতি সঙ্গীত প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে ঘিরিয়া। ইহারা যুগ যুগ পাহাড়ের মহিমা গাহিয়াছে — পাহাড়ে বাস করিয়া পাহাড়ের প্রাকৃতিক সম্পদে জীবিকা নির্বাহ করিয়াছে বলিয়া পাহাড়ের বা পর্বতের মহিমা গাওয়া ইহাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। বনে জঙ্গলে জীবিকার উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া ইহাদের নিত্যই বন্য প্রাণীর হিংস্রতার মুখোমুখীহইতে হয়। ইহারা কখনও সেই হিংস্র প্রাণীদের বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে দমন করিয়াছে আবার কখনও তাহাদের কাছে পরাভূত মানিয়া তাহাদের বন্দনা গাহিয়াছে। তাহাদের পূজার ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহাদের খুশী করিবার জন্য নৃত্য গীত অনুষ্ঠানের আসর বসাইয়াছে।

গোরাচাঁদের পূজা ও গান, মনসার নৃত্য গীত, মাহুতবন্ধুর গান প্রভৃতি উৎসব হয়ত বা তাহাই। তিস্তা, করতোয়া, রায়ডাক, তোর্ষা প্রভৃতি নদীর অববাহিকায় উত্তর বাংলায় যে দিগন্তবিস্তৃত 'ডাঙ্গা' প্রান্তর রহিয়াছে উত্তর বাংলার জনজীবনে তাহার প্রভাবও কম নয়। উত্তর বাংলার কৃষিকেন্দ্রিক জীবনের অধিকাংশ সময়ই কাটে এই সমস্ত বিস্তীর্ণ নদী চরায়। পাথারী গান, মৈষাল বন্ধুর গান, বন্ধুয়ানী গান, ভাওয়াইয়া গান ভাওয়ার প্রান্তরকে আশ্রয় করিয়াই সৃষ্ট হইয়াছে কিনা কে জানে। উত্তর বাংলা কৃষি প্রধান অঞ্চল। উত্তর বাংলায় নাগরিকরণ ঘটিয়াছে খুবই কম। আজিও এখানকার অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী এবং কৃষি নির্ভর। কাজেই স্বাভাবিক কারণেই উত্তর বাংলার উৎসব অনুষ্ঠানে, নৃত্য গীত, আনন্দ কৃষি প্রসঙ্গ আসিয়াছে বারে বারে এবং অনিবার্য ভাবেই। কৃষি কর্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানকে ঘিরিয়াই অনেক লোক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই অঞ্চলে প্রচলিত সঙ্গীতগুলির অধিকাংশই, বিশেষতঃ ব্রতানুষ্ঠানের সঙ্গীতগুলি কৃষিকেন্দ্রিক।

উত্তর বাংলা ঐতিহাসিক কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সম্পন্ন দেশ। এখানে কত রাজা মহারাজা আসিয়াছেন বসবাস করিয়াছেন। তাঁহাদের অসির ঝনঝনায় এবং চতুরঙ্গ সৈন্যের কোলাহলে দেশ একদিন কাঁপিয়া উঠিত। তাঁহাদের শৌর্যে আলোকিত দেশ ভরিয়া গিয়াছিল। কত বিচিত্র কার্য ও কীর্তি রাখিয়া তাহারা কালের গতিতে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা হারাইয়া গেলেও সবক্ষেত্রে তাহাদের কীর্তি কাহিনী হারাইয়া যায় নাই। ঐতিহাসিক অনেক রাজা মহারাজা বীর পুরুষদের কীর্তি গাথা উত্তর বাংলার লোকসমাজের সাহিত্য-সঙ্গীতে মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে বাঁচিয়া আছে। ঊষা অনিরুদ্ধের গান, গড়ীয়া, আহলর গান, অনেক ছড়া কিংবদন্তি আর প্রবাদের মধ্যে আমরা তাঁহাদের দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া সাধারণ লোক সমাজের হারাইয়া যাওয়া বহু পুরাতন কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে আমরা খুঁজিয়া পাই অনেক গল্প, গাথা আর বিভিন্ন কিংবদন্তীর মধ্যে।

উত্তর বাংলায় বিভিন্ন সময় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক সাধু, পীর ও মহাপুরুষ জন্মাইয়াছেন। তাঁহাদের জীবিত কালে তাঁহাদের জীবনকে ঘিরিয়া যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়া ছিল। এবং তাঁহাদের অলৌকিক কার্য কলাপের দ্বারা তাঁহারা লোক যুগের সমাজমানসে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন উত্তর বাংলার লোক সঙ্গীত সাহিত্যের মধ্যে তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্ম লোকায়ত সমাজের মূল ভিত্তি। ধর্ম ও ধর্মকেন্দ্রিক আচার অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়াই লোকায়ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর বাংলা তাহার ব্যতিক্রম নহে। উত্তর বাংলার লোকায়ত সমাজের জনজীবনেও প্রচলিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব প্রচুর। তাহাই এই অঞ্চলের লোকসাহিত্যের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রভাব লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো লোকসাহিত্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। ব্রতকথা, গম্ভীরা, সোনারায় প্রভৃতি লোকসাহিত্য শাখাগুলি মূলতঃ ধর্মনির্ভর।

যদিও উত্তর বাংলার বর্তমান পাঁচটি জেলা এখনই আমাদের আলোচনা ক্ষেত্র তবুও উত্তর বাংলার কোন কোন অঞ্চল এবং কোন কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীকে আমাদের আলোচনার বাহিরে রাখিতে বাধ্য হইয়াছি। দার্জিলিঙের পার্বত্য এলাকায় নেপালী, লেপচা, ভুটিয়া প্রভৃতি পাহাড়ী জাতির বাস। তাহাদের ব্যবহারিক ভাষা বিষয়ে আমাদের অধিকার না থাকায় আমরা পাহাড়ী অঞ্চলের লোকসাহিত্য বিষয়ক আলোচনায় বিরত রহিয়াছি। অন্যদিকে সাঁওতাল, টোটো, বোরো প্রভৃতি গোষ্ঠীর লোকদের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের যথার্থ জ্ঞান না থাকায় আমরা তাহাদের লোকসাহিত্যকে আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি নাই। কারণ আমরা মনে করিয়াছি লোকায়ত সমাজ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া সে বিষয়ে অধিকার চর্চা করিতে যাওয়া সৌখীন মজদুরীরই নামান্তর।

প্রবন্ধে এমন কিছু কিছু লোককবিতার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে যাহাদের আপাত দৃষ্টিতে বাঙালী সমাজ বহির্ভূত বলিয়া মনে হইলেও কিন্তু বাঙালী ব্যবহারিক জীবনে তাহাদের প্রচলন আছে বলিয়া প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছি।

উত্তর বাংলায় যে সমস্ত লোকসাহিত্যের উপাদান পাওয়া যায় সেইগুলিকে বিষয়বস্তু ও পরিবেশন ভঙ্গি অনুযায়ী প্রাথমিক ভাবে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যেমন — গ্রাম যাত্রা, পাঁচালী, গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, মেয়েলী গীত,

ছড়া, প্রবাদ, কথা ইত্যাদি। আবার এই সমস্ত ভাগকে কয়েকটি করিয়া উপবিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আমরা আলোচনার সময় সেই সমস্ত বিভাগ ও উপবিভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

যাত্রা আমাদের দেশের একটি অতি প্রাচীন সঙ্গীত ধারা। কতদিন পূর্বে আমাদের দেশে যাত্রা-গানের প্রচলন ঘটিয়াছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করা আজ আর সম্ভব নয়। পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়া থাকেন প্রাচীন সমাজের শিবযাত্রা, সাগরযাত্রা রথযাত্রা প্রভৃতি তীর্থ যাত্রানুষ্ঠান হইতেই যাত্রা শব্দের উৎপত্তি।[1] অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে যাত্রাগান সমাজের উপযোগী হইয়া সমাজের লোককে আনন্দ দিয়া আসিয়াছে। ইংরেজ আগমনের পর পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে যাত্রা গ্রাম ও নগরভেদে দুইটি ধারার সৃষ্টি করিয়াছে। শহর ও নগর কেন্দ্রিক সমাজে যাত্রা ইংরাজদের নাটক ও থিয়েটারের প্রভাবে প্রাচীন যাত্রার বৈশিষ্ট্য হইতে অনেকটা চ্যুত হইয়া নাটক ও থিয়েটারের কাছাকাছি গিয়া পড়িয়াছে। অন্য দিকে গ্রাম কেন্দ্রিক সমাজে যাত্রা আজও বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাব এড়াইয়া আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। আমরা গ্রামাঞ্চলের লোকায়ত সমাজের এই যাত্রা ধারাকেই গ্রামযাত্রা নাম দিয়া চালিয়াছি। গ্রাম ও গ্রামের লোকের জীবনের সঙ্গে এই সমস্ত গ্রাম যাত্রার যোগ অত্যন্ত সুগভীর। এইগুলি যেন গ্রামের লোকের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে। আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলা যায় — ইহারা উত্তর বাংলার লোকায়ত জীবনের সঙ্গে একাত্ম হইয়া গিয়াছে। তাহাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাইবে এই সমস্ত গ্রাম যাত্রার মধ্যে। আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে পশ্চিম বাংলার অন্যান্য অঞ্চল হইতে উত্তর বাংলায় এখন নগর ও নাগরিকরণ হইয়াছে অনেক কম। উত্তর বাংলায় গ্রাম অঞ্চলের লোকসমাজে শহর অঞ্চলের নাগরিক সংস্কৃতির প্রভাব খুব বেশী ফেলিতে পারে নাই। তাহেই উত্তর বাংলার প্রায় সর্বত্রই গ্রাম যাত্রার প্রচলন আজিও খুব ব্যাপক ভাবে দেখা যায়। জেলাভেদে ও অঞ্চল ভেদে উত্তর বাংলার এই গ্রাম যাত্রা ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচলিত। কোচবিহার জেলায় ইহার নাম 'পালাটিয়া', জলপাইগুড়িতে পাঁচাল, দার্জিলিং জেলায় 'হুলি' গান, পশ্চিমদিনাজপুর জেলায় 'খান', কিয়মা এবং মালদহ জেলায় তাহা আলকাপ নামে পরিচিত। এই গ্রাম যাত্রাগুলি জেলা ও অঞ্চল ভেদে ভিন্ন নামে পরিচিত হইলেও প্রায় সর্বত্রই ইহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একই।

১। বিচিত্র সাহিত্য - ড: সুকুমার সেন।

উত্তর বাংলার লোকায়ত পয়ার ছন্দে রচিত এক প্রকারের আখ্যান মূলক গানের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং সমতল দার্জিলিং অঞ্চলেই এই সমস্ত গানের প্রচলন বেশী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সমস্ত গানের বিষয়বস্তু হয় পৌরাণিক বা ধর্মসংক্রান্ত। শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক কোন কাহিনী বা ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া আখ্যান আকারে এই গানগুলি রচিত হইয়া থাকে। বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা এবং পরিবেশন ভঙ্গিতে পাঁচালী গানের সাদৃশ্য আছে বলিয়া আমরা এই সমস্ত আখ্যান মূলক গানের সাধারণ নামকরণ করিয়াছি পাঁচালী গান। কুশান গান, সোনারায়ের গান, রাবণ গান, ভাসান প্রভৃতি এই শ্রেণীর মধ্যে পড়িবে। দলগত ভাবে এই গানগুলি গাওয়া হয়।

গম্ভীরা উত্তর বাংলার সর্বাধিক সৃষ্টি সম্পন্ন সঙ্গীতধারা। তবে গম্ভীরা গানের প্রচলন সমাজে শুরু হইয়াছে তাহা আজিও অনির্ণীত। আলোচনা কারেরা গম্ভীরা গানের প্রাচীনতাকে প্রাচীন গণ্ডিতে লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন। শিবকেন্দ্রিক এই গম্ভীরা গান কেবলমাত্র মালদহ জেলাতেই প্রচলিত। মালদহ জেলা অঞ্চলের মধ্যেই গম্ভীরা গান সীমাবদ্ধ। বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলে শিবউৎসব কেন্দ্রিক ভিন্ন ভিন্ন গানের প্রচলন থাকিলেও গম্ভীরা গান বিষয় বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। জলপাইগুড়ি অঞ্চলে শিবকেন্দ্রিক গম্ভীরার অনুরূপ এক শ্রেণীর সঙ্গীতের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় তাহার নাম গমীরা। গমীরা গম্ভীরার সমগোত্রীয় সমধারার গান কিনা এবং পরবর্তী কালে স্থান ভেদে নামে ও বিষয়বস্তুতে কিছু কিছু বিভিন্নতা আসিয়াছে কিনা সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখিবার অবকাশ আছে। অতি প্রাচীন কালে গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তু কি ছিল তাহা স্পষ্ট করিয়া জানা যায় না। তবে শিববন্দনা এবং মানতাযাপী যে গম্ভীরা সঙ্গীতের দুটি খুব প্রাচীন ধারা তাহা অনুমান করা যায়। বিশেষতঃ গম্ভীরার মান-তাযাপীতে প্রাচীনতার এবং আদিমতম সঙ্গীত ধারার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। মানতাযাপী 'প্রিমিটিভ' জনগোষ্ঠীর একটি বিশিষ্ট সঙ্গীত ধারা। প্রিমিটিভ জনগোষ্ঠীর লোকেরা সমস্ত বৎসর ধরিয়া যে যে কার্য করিত বা যে যে ঘটনা ও সমস্যার সম্মুখীন হইত বৎসরান্তে তাহাই সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করিত। আজিও উত্তরাঞ্চলের নাগা, গারো, খাসিয়া প্রভৃতি পার্বত্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই ধরনের মানতাযাপীর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানে তাহারা মানতাযাপী বা অনুষ্ঠান হিসাবে পরিবেশন করিয়া থাকে। এই সমস্ত মানতাযাপী গানে তাহাদের সাম্বৎসরিক শিকার কৃষিকার্য এবং অন্যান্য কার্যাবলীর বিবরণ থাকে। গম্ভীরার আদ্য মানতাযাপীতে

সারা বৎসরের স্থানীয় এবং দেশের বিদেশের ঘটনাবলীর বর্ণনা পাওয়া যায়। গম্ভীরওয়া মনে করিয়া থাকেন যে মালদাবাসীর মধ্যে গম্ভীরার 'স্মৃতিপটি' বা প্রাচীন সমাজের ঐতিহ্যকে আজিও বহন করিয়া চলিয়াছে। বর্তমান গম্ভীরায় শিববন্দনা ও মালদাবাসীছাড়া আজও বিভিন্ন বিষয়ের গান সংযুক্ত হইয়াছে। আধুনিক গম্ভীরা গানে সমাজ ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও চরিত্রের সমালোচনা মূলক গানের খুব প্রচলন হইয়াছে। সাম্প্রতিককালে স্থানীয় [illegible] আসরগুলির অনুকরণে আখ্যান মূলক পালা গানেরও প্রচলন লক্ষ করা যায়। অবশ্য প্রায় বেশীর ভাগ, ঐগুলির আখ্যানের বিষয় বস্তু সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলী।

ভাওয়াইয়া গান উত্তর বাংলার সর্বাধিক প্রচলিত এবং জনপ্রিয় সঙ্গীত ধারা। উত্তর বাংলার কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, সমতল দার্জিলিং এবং পশ্চিমদিনাজপুর জেলার বেশকিছু অঞ্চল জুড়িয়া ভাওয়াইয়াগানের ব্যাপ্তি। উত্তর বাংলার অন্যতম প্রাচীন অধিবাসী রাজবংশী, কোচ, মেচ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাওয়াইয়া গানের প্রচলন খুব ব্যাপক। ভাওয়াইয়া গানের সুর বিষয়বস্তু এবং তাদের আবেদন শ্রোতার মনে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন লোকসাহিত্য বিশারদ অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় ভাওয়াইয়া সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন —' এই অঞ্চলে প্রেম সঙ্গীতই সাধারণভাবে ভাওয়াইয়া গান বলিয়া পরিচিত। ভাবমূলক গান অর্থেই ভাওয়াইয়া গান কথাটা ব্যবহৃত হইলেও প্রেম ব্যতীত অন্য কোন ভাব ইহাতে সাধারণতঃ প্রকাশ পায় না।'[১] ভাওয়াইয়ার উৎপত্তি ও নামকরণ সম্পর্কে নানা মতের সন্ধান পাওয়া যায়। এবং সেই মতগুলির বিতর্কের অবকাশ আছে। ভাওয়াইয়া গানের নামকরণ সম্পর্কে ভাওয়াইয়া প্রচলিত অঞ্চলে এবং ভাওয়াইয়া গায়ক ও আলোচনাকারদের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন প্রচলিত মতেরও আলোচনা করিয়াছি। মতগুলির সত্যতা সম্পর্কে যাচাই হওয়া প্রয়োজন।

ভাওয়াইয়া একটি বিস্তৃত ধারার গান। গানের প্রধান ভাব নরনারীর প্রেম। বৈষ্ণবপদাবলীর মতো পারমার্থিক নয় জাগতিক প্রেমই ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের প্রধান বিষয়বস্তু

১। লোকসঙ্গীতরত্নাকর : ৪র্থ খণ্ড - পৃষ্ঠা : ১৫৩১। — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

ভাওয়াইয়া গানের বিষয়বস্তু, পরিবেশন প্রভৃতির বিচারে ভাওয়াইয়া গানকে কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করা বোধ হয় খুব অযৌক্তিক নয়। আমরা অন্ততঃ আলোচনার সুবিধার জন্য এবং সুষ্ঠুতার জন্য ভাওয়াইয়ার সঙ্গীতধারাকে বিভিন্ন উপবিভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করিয়াছি। উপবিভাগগুলির মধ্যে দরিয়া (ভাওয়াইয়া), চটকা, মৈষালবন্ধু, মাহুতবন্ধু, দোতরা প্রভৃতি প্রধান।

লোকায়ত জীবনে নারী সমাজের সঙ্গীতগুলি গীত নামে পরিচিত। এই গীতগুলির বেশীর ভাগই কোন না কোন অনুষ্ঠানে গাওয়া হইয়া থাকে। অনুষ্ঠান ভেদে এই গীতগুলি বিবাহ-গীত, বাস্তুপূজার গীত, সাধভক্ষণের গীত, মুসলমানি করা গীত, ব্রতানুষ্ঠানের গীত প্রভৃতি নামে পরিচিত।

বিবাহ সঙ্গীত যেহেতু আচারাশ্রিত সঙ্গীত অর্থাৎ অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক সঙ্গীত সেই জন্য বিবাহ অনুষ্ঠান ছাড়া এই গীতগুলি পৃথক ভাবে গাওয়া হয় না। বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্রই বিবাহ সঙ্গীতের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ফলে দ্রুতই এইগুলি বিলুপ্তির পথে চলিয়াছে।

উত্তর বাংলার গ্রামাঞ্চলে এখনও বিবাহ সঙ্গীতের বেশ প্রচলন লক্ষ করা যায়। উত্তর বাংলার বিবাহ সঙ্গীতের সব চাইতে বড় বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় এগুলির বিষয়বস্তুতে। বঙ্গদেশের অন্যত্র প্রচলিত বিবাহ সঙ্গীতের বিষয়বস্তুতে প্রায় সর্বত্রই রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ এবং শিবদুর্গার বিবাহের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। শিবদুর্গা অথবা রামসীতার বিবাহের কথাই গীত হয় বিবাহ আসরে। কিন্তু উত্তর বাংলার বিবাহের গীতে রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ অথবা শিবদুর্গার পরিবর্তে সাধারণ বরকনের কথাই বলা হইয়া থাকে। প্রায় সর্বত্রই এখানকার বর কনে সমাজের সাধারণ মানুষ, অলৌকিক দেবদেবীর বর্ণনা আসিয়া এই গানে ভীড় করে না। যেহেতু বিবাহ সঙ্গীত অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক গীত কাজেই বিবাহের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া এবং সেই বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত হয়। বিবাহের প্রথম আচারটি হইতে আরম্ভ করিয়া গাত্র হরিদ্রা, সিন্দুর দান, পাত পাক প্রভৃতি প্রতিটি আচারকে কেন্দ্র করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গীত গাওয়া হইয়া থাকে।

নারী সমাজের আচারাশ্রিত সঙ্গীতগুলির মধ্যে বিবাহ-গীত ছাড়াও মেয়েদের গর্ভকালীন সাধভক্ষণ, মুসলিম সমাজের মুসলমানী অনুষ্ঠান, উপবীত ধারণ, পুর

পুণ্যকালে বাস্তুপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে ও উত্তর বাঙলার জাগাগান মালীপাড়ে বিভিন্ন গীতের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতগুলি কেবলমাত্র অনুষ্ঠান কালে এবং অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়াই গীত হয়। অনুষ্ঠান ছাড়া ইহাদের প্রয়োগ পাওয়া যায় না।

'কথা' লোক সাহিত্যের একটি প্রধান শাখা। বঙ্গদেশের লোককথা সাহিত্যের মত উত্তর বাঙলাতেও লোককথার ব্যাপক প্রচলন ও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যেমন সংখ্যায় প্রচুর তেমনি লোক সমাজে এইগুলির প্রচলন ও জনপ্রিয়তা উল্লেখনীয়। 'কথা'র বাহন ছন্দ বদ্ধ পদ্যের বদলে সরল গদ্য হওয়ায় ইহা সহজেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে, দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে অতি সহজেই প্রসার লাভ করিয়া থাকে। কথার মধ্যে প্রায় সর্বত্রই একটা মনোরম কাহিনী বা আখ্যান থাকে বলিয়া সমাজে ইহাদের জনপ্রিয়তা ও ব্যাপকতা সহজ হয়। লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখা হইতে লোক কথার প্রচলন ও ব্যাপকতা অনেক বেশী।[১] লোকসাহিত্যের কথা পর্যায়ের সাহিত্যকে কথা, উপকথা, রূপকথা, প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় অনুমান করেন —'অপূর্বকথা' হইতেই 'রূপকথা ও উপকথা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।[২]

লোক কথার সংগ্রহ ও আলোচনা দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। প্রথমতঃ দেশের ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় লোককথার একটি বিশেষ স্থান আছে। প্রতি সমাজেই নারীর ভাষা অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল। কাজেই লোকসমাজের সাধারণী নিরক্ষরীরা যখন তাহাদের মৌখিক ধারায় লোক কথাগুলি আবৃত্তি করেন, তখন তাহাতে সেই সমাজের প্রচলিত ভাষার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রূপটি প্রকাশ পায়। এই কথাগুলি সেই সেই অঞ্চলে প্রচলিত আঞ্চলিক রূপ অনুযায়ী নিখুঁত ভাবে সংগ্রহ করিতে পারিলে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক কথ্যভাষার রূপ (Dialect) অনুশীলনের পক্ষে লোককথা বিশেষ সহায়ক হইতে পারে।

১। বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

২। বিচিত্র সাহিত্য — ডঃ সুকুমার সেন।

দ্বিতীয়তঃ জাতি তত্ত্বের আলোচনায়ও লোককথার একটি বিশেষ মূল্য রহিয়াছে। লোককথাগুলি দীর্ঘদিন সমাজে প্রচলিত থাকায় জাতির অধুনালুপ্ত অনেক কথা, সংস্কৃতি বা বৈশিষ্ট্যকে ধরিয়া রাখে। এই লোককথাগুলির বিশ্লেষণ করিলে জাতির অনেক লুপ্ত প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের কথা জানিতে পারা যায়।

তৃতীয়তঃ জাতির মধ্যে নৃতত্ত্বের যে সকল কথা উল্লেখের প্রয়োজন রাখে না। লোককথাগুলির মধ্যে নৃতত্ত্ব বিষয়ক অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। কোন জাতি বা সমাজের নৃতত্ত্ব বিশ্লেষণে লোককথার স্থান অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

সমাজ-মনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও লোককথাকে বিশেষ ভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে। প্রাচীন সমাজমনের অনেক কথারই লোককথাগুলির মধ্যে অনুসন্ধান পাওয়া যায়। উত্তর বাংলার সমাজমনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এগুলি অপরিহার্য।

উত্তর বাংলার লোককথাগুলিকে বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যেমন — রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, কিংবদন্তী প্রভৃতি।

ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন —'অপূর্ব কথা হইতেই 'রূপকথা'র উদ্ভব। রূপকথাগুলি আপাত দৃষ্টিতে শিশুমনের উপযোগী রচনা মনে হইলেও ইহাদের মধ্যে বয়স্ক মনের অনেক চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়।

উপকথাগুলি সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন — অপূর্ব কথা হইতে রূপকথা এবং রূপকথা হইতে উপকথা জাগিয়াছে। উপকথাগুলির মধ্য দিয়া আমরা মানব সমাজে পরিচিত অনেক জীবজন্তুর কথা জানিতে পারি। উপকথাগুলির মধ্য দিয়া সমাজের অনেক প্রাচীন রীতি নীতির কথাও জানিতে পারা যায়।

বাংলা ভাষায় লোককথার সংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে বেশ কিছুদিন আগেই। কিন্তু সেগুলি প্রায় সবই খণ্ড বিচ্ছিন্ন এবং আঞ্চলিক সংগ্রহমাত্র। এই সমস্ত সংগ্রহে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হয় নাই। কোন কোন সংগ্রহে স্থানীয় ভাষার বদলে সাধু ভাষার ব্যবহার করা হইয়াছে আবার কোন সংগ্রহে স্থানীয় ভাষা ব্যবহৃত হইলেও কথার প্রকৃতি চরিত্র বজায় রাখিতে পারেন নাই। বাংলা ভাষায় লোককথার সামগ্রিক ও ব্যাপক সংগ্রহ এবং আলোচনার উদ্যোগ যিনি করিয়াছেন তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন লোকসাহিত্য বিশারদ প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনি তাহার 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে লোককথার ব্যাপক সংগ্রহ আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

ব্রত ও ব্রতকথা সমগ্র বাঙালী জাতির মতো উত্তর বাঙলার লোক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উত্তর বাঙলার ব্রত কথাগুলি বেশীর ভাগই কৃষিকেন্দ্রিক। কৃষির সঙ্গে উত্তর বাঙলার জনজীবনের যোগ গভীর বলিয়া ব্রতগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষি কেন্দ্রিক হইয়া উঠিয়াছে। উত্তরবাঙলায় কিছু ব্রত প্রচলিত আছে তাহা কেবলমাত্র কুমারী কন্যাদের দ্বারাই আচরণীয়। বয়স্কা নারী বা পুরুষের এখানে প্রবেশাধিকার নাই। এই সমস্ত ব্রতকে 'কুমারী ব্রত' বলা যাইতে পারে। আবার আর কিছু সধবার ব্রত আছে যাহা কেবলমাত্র বিবাহিতা নারীদের দ্বারাই প্রতিপালিত হয়। এইগুলির মধ্যে নারীজীবনের অনেক প্রসঙ্গ জড়াইয়া আছে। এই ব্রতগুলিকে নাম দেওয়া যাইতে পারে সধবাব্রত। ইহা ছাড়া পুরুষের আচরণীয় কিছু ব্রতের সন্ধানও পাওয়া যায়। এই ব্রতগুলি সারা বছর ধরিয়াই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

কিংবদন্তী সমাজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ বিশ্বাসের অনুভূতি। উত্তর বাঙলায় লোক সমাজে অনেক কিংবদন্তীর সন্ধান পাওয়া যায়। এই সমস্ত কিংবদন্তীর মধ্যে উত্তর বাঙলার জনজীবন, নদনদী, জীবজন্তু সম্পর্কে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। কিংবদন্তীগুলির মধ্যে সমাজের অনেক অতীত ঘটনা, আচার আচরণ এবং বিশ্বাসের কথা জানিতে পারা যায়। একটি সমাজ বা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় কিংবদন্তীর সহায়তা অনস্বীকার্য।

ছড়ার সামগ্রিক রূপ সকলের সর্বত্র প্রায় এক হইলেও উপকরণে সেই সেই অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি, জল হাওয়া ও ভূ-প্রকৃতির প্রভাবে কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য আসিয়া যায় স্বাভাবিক কারণেই। ছড়ার সামগ্রিক রূপের মধ্যেও সেই সেই অঞ্চলের নদনদী, মাঠ প্রান্তর, পশু পাখি, সাহিত্য সংস্কৃতি মানুষ এবং তাহা তাহাদের মধ্যে নিজস্ব স্থান করিয়া লয়। সেই অর্থে উত্তর বাঙলায় ছড়ারও কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য খুবই স্পষ্ট। মালদহ জেলার দক্ষিণ অংশ বাদ দিয়া উত্তর বাঙলার প্রায় সর্বত্রই ছড়াগুলি রাজবংশী ভাষায় রচিত। রাজবংশী ভাষার অন্যগুণ আর যাহাই থাকুক না কেন এই ভাষার ধ্বনি ও ছন্দের দোলা খুবই স্পষ্ট। শব্দ ভাণ্ডারে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ছড়াছড়ি। ফলে উত্তর বাঙলার ছড়াগুলির মধ্যে ঐ সমস্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দের সৃষ্টি এবং বহুল প্রয়োগের জন্য ছন্দের দোলা ও মাধুর্য অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে। ছড়ার বিষয় বস্তু অনুসারে ইহাদের বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা যায়। আলোচনায় আমরা ছড়ায় এই সমস্ত শ্রেণী বিভক্ত করিয়া আলোচনার চেষ্টা করিয়াছি।

প্রবাদকে পণ্ডিতজন এবং লেখকরা বলিয়াছেন –

মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ মাধ্যমের নাম 'প্রবাদ'।

প্রবাদ কিভাবে সমাজে প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল সে সম্পর্কে কিছু বলিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ সমাজের কোনো জীবনরস রসিক মানুষ তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা বিশেষ ভঙ্গিতে প্রকাশ করিতে গিয়া প্রবাদের সৃষ্টি করে। পরে সমাজের আর দশজন তাহা জীবনের সঙ্গে গভীর ও বাস্তবভাবে সুসঙ্গত বুঝিয়া তাহা গ্রহণ করে। সম্ভবতঃ এইভাবেই প্রাচীনকালে প্রবাদের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল।

সমাজে প্রবাদের প্রচলন যেমন প্রাচীন তেমনি ব্যাপক। প্রাচীন কাল হইতে আজ অবধি সকল যুগের সাহিত্যেই কমবেশী প্রবাদের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য বর্তমান শিক্ষিত সমাজে প্রবাদের ব্যবহার অনেক কমিয়া গিয়াছে তবুও ইহার ব্যবহার ও প্রয়োগ সম্পূর্ণ ভাবে কেহ এড়াইয়া চলিতে পারে না।

উত্তর বাংলার লোকায়ত সমাজে প্রবাদের ব্যবহার এখনও প্রচুর। এই অঞ্চলের গ্রামের মহিলারা এবং বৃদ্ধরা এখনও কথায় কথায় প্রবাদের ব্যবহার করিয়া থাকেন।

প্রবাদগুলি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক দেশের প্রবাদ অন্য দেশে খাটেনা কারণ প্রতি অঞ্চলেই প্রবাদ সেই সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়া, প্রকৃতি, সমাজ-সংস্কৃতি এবং লোক চরিত্রের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠে। উত্তর বাংলার জনজীবন, ভূ-প্রকৃতি এবং আবহাওয়া যেমন একটু স্বতন্ত্র তেমনি এখানকার প্রবাদগুলির মধ্যেও কিছু স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। উত্তর বাংলার জনজীবন এবং সংস্কার সংস্কৃতির বিশ্লেষণে এই সমস্ত প্রবাদের সাহায্য প্রায় অপরিহার্য।

বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে উত্তর বাংলার প্রচলিত প্রবাদকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায় যেমন – প্রকৃতি মূলক, গার্হস্থ্য জীবন ভিত্তিক, সমাজ সংস্কার সংস্কৃতি মূলক, পশুপাখি ভিত্তিক, আবহাওয়া ভিত্তিক প্রভৃতি। আমরা প্রবন্ধে প্রতিপাদ্যরূপেই প্রবাদের আলোচনা করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বাস্তবের সঙ্গে সেগুলির যোগাযোগ কতটা অথবা প্রবাদগুলি বাস্তব থেকে কতটা সার্থক তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ধাঁধা বা প্রহেলিকা উত্তর বাংলায় 'ছিলকা' নামে পরিচিত। কোথাও ফাকিউ বা ফাকুড়ি (তরাই অঞ্চল) নামেও এগুলি প্রচলিত আবার কোথাও কোথাও এগুলি ফটকী নামেও (মালদহ) প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

লোকায়ত মানব জীবনে এবং সাহিত্যে ছিলকার প্রভাব আজিও অপরিসীম। প্রাচীনকালে সকল দেশে সকল শ্রেণীর মানব সমাজেই ছিলকা বা প্রহেলিকার প্রভাব ছিল প্রচুর। বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই প্রহেলিকার আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। মনে হয় যেন বাংলা সাহিত্যের আবির্ভাব কাল হইতেই প্রহেলিকা সাহিত্যে আপন স্থান করিয়া [illegible] রাখিয়াছে।

লোকসাহিত্যের কথা লোকজীবনে প্রহেলিকা আজিও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। উত্তর বাংলার লোকায়ত জনজীবনে অবসর যেমন কম তেমনি অবসর বিনোদনের মাধ্যমেরও একান্ত অভাব। তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই অবসর বিনোদনের জন্য 'ছিলকা'র অবলম্বন করিয়া থাকে। দিনান্তে পরিশ্রমের শেষে কথার মজলিশ আসরে বা সামাজিক বৈঠকেও ছিলকা এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে।

উত্তর বাংলার ছিলকাগুলির মধ্যে বঙ্গের অন্যত্র প্রচলিত ধাঁধা বা প্রহেলিকার সঙ্গে কিছু কিছু মিল থাকিলেও অনেক ছিলকাই উত্তর বাংলার নিজস্ব ফসল। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

উত্তর বাংলার ছিলকাগুলি বেশীর ভাগই রাজবংশী উপভাষায় রচিত। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রচলিত বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার চালেও ছিলকার প্রচলন আছে।

উপরিউক্ত ধারাগুলি ছাড়াও উত্তরবাংলায় আরও কিছু কিছু উপাদান লোকসাহিত্যভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যায়। এই ধারাগুলি উপাদান ধারা ধরিয়া পৃথক পৃথক অধ্যায় করা হয় নাই। 'বিবিধ' অংশের মধ্যে [illegible] সমস্তগুলির পৃথক পৃথক আলোচনা করা হইয়াছে।

উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য সম্পর্কে পরিশেষে বলা যাইতে পারে নগর অনুকরণপ্রক্রিয়া উত্তর বাংলার গ্রাম বাংলাকে এখনও পুরোপুরি প্রভাবিত করিতে পারে নাই। উত্তর বাংলার গ্রাম ও লোকসমাজ আপন স্বকীয়তায় স্থির। তাই বাংলার এই প্রান্তের লোকসংগীত, সাহিত্য ও ইহাদের উৎস জনমানস নিজস্ব মৌলিকতায় পুষ্ট হইবার সুযোগ পাইয়াছে। বিভিন্ন সঙ্গীত ও বিচিত্র লোকসাহিত্যের

সমাবেশ উত্তর বাংলায় যেমন ছিল এবং এখনও যাহা আছে বলের আর কোন অঞ্চলে এই ধরণের লোকশিল্প ও সঙ্গীত বা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে যাহা উত্তর বাংলা অগ্রাধিকার দাবী করিবে। নানান বিষয়বস্তু লইয়া বিচিত্র সঙ্গীত ধারা, অনেক বিশেষ পূজার ধর্মীয় সঙ্গীত, সুর ভঙ্গির আনন্দ বাড়ি মেলানো ভাওয়াইয়া এবং চটকা, শীনাথ গুরুদের মাহিষা কীর্তন, সত্যপীর বিষের গান নিঃসন্দেহে এই অঞ্চল সঙ্গীত সাধনার বাহুল্যই নির্দেশ করিতেছে। এই বিচিত্র লোকসঙ্গীত ও সাহিত্য শুধুমাত্র এ অঞ্চলের [illegible] সম্পত্তি নয় — সমগ্র বঙ্গদেশের লোক সাহিত্যের এইগুলি বিশেষ একটি অঙ্গ এবং মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদের দায়িত্ব আমাদের সকলের।

*****